Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমতা। সমতার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর লড়াই-এর মূল্যবান গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গেলে বা সমতার দাবির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। যে মুহূর্তেই, সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম ও মজুরীর সমতা অর্জিত হবে— সেই মুহূর্তেই মানবতার কাছে আনুষ্ঠানিক সমতার প্রশ্ন থেকে প্রকৃত সমতার স্তরে উত্তরণের গতিময়তার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে। —লেনিন

# গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

আনিস খানকে পূর্ব পরিকল্পনা করে নৃশংস খুন ১

দেশে বিদেশে ২

নির্বাচন কমিশনে বামফ্রন্টের দাবি ৩

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ৪

ইউক্রেন.... জার্মানীর প্রাসঙ্গিকতা ৫

আমরা রক্তবীজের ঝাড় ৬

আনিস হত্যা.... ৭

68th Year 45th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 26th February 2022

## সম্পাদকীয়

# দুর্বৃত্ততন্ত্র নিপাত যাক

আনিস খানকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্যে শাসকদলের নেতৃত্বে সরকারি ক্ষমতাসহ তাদের পোষিত দুর্বৃত্তদঙ্গলের নির্মিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রধানত রাজ্যের প্রতিবাদী ছাত্র যুব সমাজ এবং আনিসের গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন গ্রামবাসীদের অনমনীয় মনোভাব এই নিষ্ঠুর সত্যটিকে সমাজের সামনে আনতে সক্ষম হয়েছে।

বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত পৌরসভা পৌরনিগম থেকে শুরু করে বিধানসভা পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করতে স্বেচ্ছাচারী নেত্রীর নেতৃত্বে এরাজ্যে কার্যত দুর্বৃত্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শীর্ষস্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্বৃত্ততন্ত্র নিপীড়ন-সন্ত্রাস এবং তথাকথিত জনবাদী প্রকল্পএবং একদল সরকারি অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুর্বৃত্ত বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় এক প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশব্যাপী গরিষ্ঠতাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং রাজ্যের এই দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দলটির জন্ম ও বিকাশ অবক্ষয়প্রাপ্ত আগ্রাসী পুঁজিবাদের গর্ভে। সংঘ প্রভাবিত লুম্পেনতন্ত্র এবং সংখ্যালঘু বিদ্বেষের বিষে যে দুর্বৃত্ততন্ত্রকে ন্যায্যতা দেয়, তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে বামপন্থীদের দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলনের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতির সুযোগে অর্থাৎ বেকারত্ব এবং সমাজবোধ বিচ্ছিন্ন নয়াউদারবাদী সংস্কৃতির সুযোগে সেই দুর্বৃত্ততন্ত্রকে ন্যায্যতা দিয়েছে।

ইতিহাসের ছাত্র, বিশেষ করে বামপন্থীদের কাছে এধরনের দুর্বৃত্ততন্ত্র শুধুমাত্র বর্তমানযুগের অবক্ষয়িত পুঁজিবাদের ব্যাধি নয়। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সৃষ্ট মোবাইল গার্ড, রাশিয়ার জার রোমানভের অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্ল্যাক হান্ড্রেডই নয়, ফ্যাসিবাদী জমানার ব্রাউন শার্ট বা ব্ল্যাক শার্ট ও চরম প্রতিক্রিয়ার মুখ হয়ে ইতিহাসে কলঙ্কিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অদ্ভুতভাবে লুই বোনাপার্টের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মোবাইল গার্ডের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী নেত্রীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা তৃণমূলী দুর্বৃত্তমঙ্গলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রায় দেড়শ বছর আগে কার্ল মার্কস 'দ্য এইটিন্থ ব্রুমেয়ারে অফ নেপোলিয়ন বোনাপার্টে'-এ সেদিনের রাষ্ট্র দ্বারা পালিত ও পোষিত দুর্বৃত্তদঙ্গলের শ্রেণিচরিত্র তুলে ধরেছিলেন। একদিকে হঠাৎ ধনী হওয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রহিত বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত, অপরদিকে ভবঘুরে, গুন্ডা, ধর্ষক, জেলখাটা আসামী, জুয়ারি, অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতাশ যুব সমাজ। অপরদিকে তাদের প্রশ্রয়দাতা দুর্বৃত্তশ্রেষ্ঠ লুই বোনাপার্ট। এছাড়া এই লুম্পেনতন্ত্রের পক্ষে সম্মতি নির্মাণকারী প্রচারযন্ত্র, একদল অনুগ্রহভাগী বুদ্ধিজীবীদেরও মার্কস-এঙ্গেলস সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

নয়াউদারবাদী বিশ্বে লগ্নিপুঁজির আধিপত্য অনেকাংশে উৎপাদনশীল পুঁজির প্রাধান্য খর্ব করে ফাটকা পুঁজির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে দেশে দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত স্যাঙাৎ পুঁজিপতির দঙ্গলকে।

এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেভাবেই গড়ে তুলেছে নীচুতলায় একদল কর্মী, যাদের বেঁচে থাকতে হয় নিম্নতম স্তরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কাজে অথবা নেতাদের বদান্যতায় বা ক্লাবের অনুদানে। পঞ্চায়েত পৌরসভায় সরকারি কাজের নেতাদের অসদুপায়ে প্রাপ্তির উপরির ছুঁড়ে দেওয়া অর্থে। পুলিশ এবং উচ্চতর নেতা এবং একশ্রেণির আমলাদের নিয়ে এভাবেই বেড়ে উঠেছে দুষ্টচক্র।

এই দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে যখনই কেউ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে তখনই তাকে ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করা হচ্ছে। আর ভোটের সময় চলছে বিজেপি'র সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ, অর্থ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। এভাবেই দুর্বৃত্ত জীবনধারা, সীমাহীন ভোগবিলাস ও রাজ্যের পুলিশি-প্রশাসনিক ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতির উত্থান ও পুনর্জন্ম ঘটছে।

সুতরাং এই দুর্বৃত্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা যে নির্বাচন বা নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচির চেয়েও মাঠে ময়দানে স্কুল কলেজে নাগরিক সমাজে—তার পথ খুলে দিয়েছে রাজ্যের ছাত্র যুব সমাজ। এই লড়াই-এর সঙ্গে যত শ্রমজীবী শ্রেণি ও বৃহত্তর নাগরিক সমাজ কাঁধে কাঁধ দিয়ে এগিয়ে আসবে—ততই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুর্বৃত্ত নেতৃত্বের ভিত কেঁপে উঠবে।

## আনিস খানকে পূর্ব পরিকল্পনা করেই নৃশংস খুন

# এমন হত্যাকাণ্ডে যুক্ত সমস্ত দুর্বৃত্তের যথাযথ বিচার ও শাস্তি চাই

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে হাওড়া আমতা থানার প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে দক্ষিণ সারদা গ্রামে নিজের বসতবাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন হলেন আনিস খান। সদ্য ২৭ পেরোনো এক তরতাজা যুবক। মাত্র কিছুকাল আগেই কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আনিস। প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা এই ছেলেটি কৈশোরকাল থেকেই প্রতিবাদী ও ভাবুক প্রকৃতির। সচেতনভাবেই ছাত্রাবস্থায় বাম রাজনীতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ।

১৯ ফেব্রুয়ারির দৈনিক সংবাদপত্রগুলি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সংবাদটি প্রকাশ করেনি। কারণ, সম্ভবত কলকাতা শহর থেকে অনেকটা দূরে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। রাত্রি প্রায় ১টায় সংঘটিত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পৌঁছতে পৌঁছতে সংবাদপত্র ছাপানো শেষ। টেলিভিশন চ্যানেলগুলির অনেক ক'টিই দ্রুত পৌঁছে যায় অকুস্থলে এবং সারা রাজ্যে হাড় হিম করা এমন সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষ এমন বীভৎস খুনের সংবাদে শিহরিত হয়ে ওঠেন। আর স্থিতাবস্থা বিরোধী বিপুল সংখ্যক ছাত্রসমাজ তাদের ঘনিষ্ঠ লড়াকু ছাত্রনেতার এমন হত্যার বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। কলকাতা, যাদবপুর এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও দ্রুত যুক্ত হয়ে পড়ে এমন নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। বাঁধ না মানা উত্তাল ছাত্র বিক্ষোভ কলকাতার পার্ক সার্কাস মোড়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। সেই বিক্ষোভ সমাবেশে ওই অঞ্চলটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ব্যাপ্ত এই বিভোক্ষ সমাবেশ থেকে একটি দাবিতেই সবাই সোচ্চার হয়ে ওঠে যে, আনিস খানের মতো এক আপসবিরোধী ছাত্র নেতার খুন হয়ে যাওয়া কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে যথাযোগ্য শাস্তি দিতেই হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধে থেকেই দাবি ওঠে আনিসের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। প্রতিবাদী আন্দোলন ক্রমশই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সমগ্র রাজ্য জুড়ে। ২০ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন সামিল। সকাল থেকেই আমতা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলে। ২০ ফেব্রুয়ারি নিহত আনিস খানের বাড়িতে পৌঁছে যান আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পি এস ইউ'র রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহ. সফিউল্লাহ, কম. রুবেল শেখ, কম. দেবজ্যোতি দাস (রাজা) এবং পি এস ইউ সভাপতি কম. কৌশিক ভৌমিক। তাঁরা নিহত আনিসের বাবার সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলেন এবং খুনীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

আনিসের পিতা সালেম খান সহ তাঁর পরিবার এবং প্রতিবেশীদের অভিযোগ, একজন পুলিশ অফিসারের পোষাক পরিহিত ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ব্যক্তির সঙ্গে আরও তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার গভীর রাতে আনিসের নির্মীয়মান বাড়িতে কড়া নাড়ে। বৃদ্ধ পিতা নিজেই বাড়ির সদর দরজা খোলেন। পুলিশবেশী ঘাতকরা আনিসের খোঁজ করে এবং বলে যে, আমতা ও বাগনান থানায় আনিসের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ আছে। আনিসকে ধরতে এসেছে তারা। সালেম খানের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বার্তালাপের মধ্যেই তিনজন ঘাতক প্রায় দৌড়ে বাড়ির ওপরতলায় চলে যায় এবং বৃদ্ধ পিতাকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নীচে আটকে রাখা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সালেম খান ওপর থেকে বাড়ির সামনের স্বল্প পরিসর রাস্তায় ধপ করে কিছু ভারী বস্তু পড়ার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠেন। তার মধ্যেই তিনজন পুলিশ দৌড়ে নীচে নেমে আসে। বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারকে জানায় যে কাজ শেষ। দ্রুত বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় পুলিশ বেশী ঘাতকরা। আর বৃদ্ধ সালেম খান দেখেন তাঁর দরজার সামনেই রক্তাক্ত নিথর হয়ে পড়ে আছেন বাড়ির ছোট ছেলে আনিস খান। রক্তে প্লাবিত পথ। বাড়ির অন্যান্যরা ঘুম ভেঙে বেরিয়ে আসার মধ্যেই সব শেষ।

চীৎকার চেঁচামেচিতে আনিসের প্রতিবেশীরাও অনেকে দৌড়ে আসেন। দ্রুত আনিসকে নিয়ে চিকিৎসা বা প্রাণ বাঁচানোর মরীয়া চেষ্টায় হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই বোঝা যায় যে আনিসের দেহে আর প্রাণ নেই। সে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সালেম খান স্বয়ং আমতা থানায় টেলিফোন করে পুলিশী হস্তক্ষেপের দাবি করেন। তিনি জানতে চেষ্টা করেন আমতা থানা থেকে কোন কোন পুলিশ দক্ষিণ সারদা গ্রামে তাঁর বাড়িতে এসে আনিসকে এমনভাবে খুন করে গেল। কেনই বা এমন হলো!

আমতা থানার কর্তব্যরত পুলিশ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করে না। সারা রাত আনিস খানের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরিবারে ছোট ছেলে আনিস। তার এমনভাবে খুন হয়ে যাবার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পরিবারের কেউ বুঝতে পারে না। গ্রামের প্রতিবেশীরাও হতবাক, বিহ্বল। দীর্ঘ প্রায় আট-ন'ঘণ্টা পরে আমতা থানার পুলিশ পুঙ্গবরা আনিস খানের মৃতদেহ দখল করতে আসে। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া বিহ্বল পিতা, বড় ভাই সাবির খান সহ অন্যরা আপত্তি করেন নি। পুলিশ মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে দেহ নিয়ে যায়। বাড়ির সকলের কাছে মুখ্য প্রশ্ন ছিল খুন করে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিচয়। স্থানীয় পুলিশ কোনও তদন্তের আশ্বাস দেয়নি। দায়সারা ভাব আমতা থানার। কোনক্রমে

এরপর ৪ পাতায়

## মায়ানমারে সামরিক শাসকদের চাপে অভিভাবকরা সন্তানদের ত্যাজ্যপুত্র করতে বাধ্য হচ্ছে

মায়ানমারে অভিভাবককুল —সামরিক শাসকদের অত্যাচার ও ধরপাকড়ের ভয়ে সংবাদপত্রে প্রতিদিন সন্তানদের ত্যাজ্যপুত্র করার সিদ্ধান্তের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন বলে রয়টার প্রেরিত এক সংবাদে জানা গেল। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই বলা হচ্ছে সন্তানেরা তাঁদেরা কথা অমান্য করার জন্যই বাবা মায়েদের এমন অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে। অভিযোগ, ২০০৭ সাল থেকে সম্পত্তি দখল ও গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে সেনাবিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের বাবা মায়েদের থেকে এই ধরনের ঘোষণা মায়ানমারের সামরিক শাসককুল আগেও আদায় করত। তবে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ফের সেনা অভ্যুত্থানের পর এমন ঘটনা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত নভেম্বরে সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, কোনও পরিবারের সন্তান সরকার বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে সেই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এমন কি পলাতক বিক্ষোভকারীর পরিবারের অন্য সদস্যদের গ্রেফতারও করা হতে পারে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কেই অধিকাংশ পরিবার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের সন্তানদের ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করছেন বলে অভিযোগ। তবে সামরিক প্রশাসনের দাবি, এমন ঘোষণার পরও যদি দেখা যায় এই পরিবারের অন্য সদস্য সরকার বিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত তাহলেও গ্রেফতারি এড়ানো যাবে না। ইতিহাসের শিক্ষা, এমন দুঃশাসন চিরদিন চলতে পারে না। প্রতিবাদ আন্দোলনের টুঁটি টিপে ধরার জন্য আতঙ্কিত মায়ানমারে সামরিক শাসক এই কৌশল অবলম্বন করলেও শেষরক্ষা হবে কী?

## আই এম এফ ঋণভারে জর্জরিত আর্জেন্টিনা

লাতিন আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ দেশ আর্জেন্টিনা অর্থনৈতিক ভীষণ সঙ্কটে জর্জরিত। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে তার ঋণের পরিমাণ এখন ৪৪ বিলিয়ন ডলার। এই ঋণ আর্জেন্টিনার দুর্নীতিগ্রস্ত দক্ষিণপন্থী সরকার গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের ফাঁস থেকে মুক্ত হতে চায় আর্জেন্টিনা। প্রেসিডেন্ট আলর্বাতোকে রাশিয়া চিনের দরজায় ছুটতে হয়েছে। ইউরেশিয়ার শক্তিগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে উৎসাহী আর্জেন্টিনা। চিনের Belt and Road Initiative য়ে যোগ দিয়েছে আর্জেন্টিনা।

সমস্যা হল, এই এলাকা অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার বড়দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বরাবরই বিষম যন্ত্রণা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে তার অপরিসীম উৎসাহ। সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করা থেকে শুরু করে স্বাধীন, স্থিতিশীল সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করা, ঋণের ফাঁদে ফাঁসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানা দুষ্কর্মে অভ্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অবাধ্য রাষ্ট্র হলে প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা জারি অর্থাৎ, ধোপা নাপিত বন্ধ করে টাইট দেওয়ার রাজনীতি করতে পিছু পা নয় সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "front yard" বলেই মনে করেন। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এমন কথাই বলেছেন।

মার্কিন আধিপত্য থেকে মুক্তির কামনায়, বাঁচার তাগিদে বিকল্প চায় আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য একাধিক লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সরকার। সাগরের অন্যপাড়ের দেশগুলি—চিন এবং রাশিয়ার সঙ্গে জোট বাঁধতে এদের অনেকেই আগ্রহী। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট ঠিক এই কাজটাই করেছেন। চিনের সাথে একগুচ্ছ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আলবার্তো ফার্নান্ডেজ, রাশিয়ার সাথেও অর্থনৈতিক জোট গঠনে আগ্রহী আর্জেন্টিনা। মস্কোর কাছে তার অনুরোধ, রাশিয়া যেন লাতিন আমেরিকায় ঢোকার জন্য আর্জেন্টিনাকে দরজা হিসাবেই ব্যবহার করে। চিন ২৩.৭ বিলিয়ন ডলার আর্জেন্টিনায় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং আর্জেন্টিনার অর্থনৈতিক অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য অনুমোদন করেছে। চিনের রাষ্ট্রনেতাদের নানা বৈঠকে আর্জেন্টিনা BRICKS (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকার)-এ যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের এত সব কর্মকাণ্ডে, পুতিন এবং পিং-এর সাথে দহরম মহরমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। প্রসঙ্গত লাতিন আমেরিকায় প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল এবং মেক্সিকোর পরেই আর্জেন্টিনার অবস্থান। কিন্তু আর্জেন্টিনা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া ঋণের বোঝা এবং নানা অর্থনৈতিক সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি সঙ্কটে জর্জরিত। তার উন্নয়নের হার এখন প্রায় স্তব্ধ। ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনার তদানীন্তন দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট মৌরাসিও মাকরি আর্জেন্টিনার জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করেছিল। আই এম এফ-এর ইতিহাসে এই ঋণের পরিমাণ ছিল বৃহত্তম—সঙ্কটমুক্ত হওয়ার জন্য ৫৭.১ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল।

আই এম এফ-এর কাছে অজানা ছিল না দুর্নীতিগ্রস্ত আর্জেন্টিনার সরকার এই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু আমেরিকার প্রভাবাধীন আই এম এফ রাজী হয়েছিল একটাই লক্ষ্য। আর্জেন্টিনাকে ঋণের জালে ফাঁসিয়ে দেওয়া। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট অনেক দর কষাকষি করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অতএব তাকে পূর্ব দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলির দিকে নজর ফেরাতেই হয়েছে।

## কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প

বিশ্বায়ন তথা নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতির আবির্ভাবের পর সারা পৃথিবীর জনগণ এখন পুঁজির তীক্ষ্ণতম আক্রমণের সম্মুখীন। সাবেক বুর্জোয়াদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদের পাখায় ভর করে ভারতীয় শিল্পপতিদের "রাজার রাজা" নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিশ্বায়ন উদারনীতির নয়া অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি একের পর এক নয়া উদারনীতিবাদী প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন করে চলেছে। সহস্রাব্দের বৃহত্তম ভ্রান্তি নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রত্যাশিত জনরোষের বিস্ফোরণ ঘটল না। ফলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইকে পুঁজির স্বার্থে নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পে সুপ্রিম কোর্টের শর্তহীন অনুমোদন তারই অংশ মাত্র। সম্প্রতি ভারতের উচ্চতম আদালতে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য শর্তহীন অনুমোদন মিলেছে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনকারীদের আন্দোলন এবং সতর্কবাণী উপেক্ষা করে দিবাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সুবনশ্রী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, গোয়ায় মোপা বিমানবন্দর প্রকল্প এবং কুলদা কয়লা খনি—ছত্তিশগড়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম কয়লা উৎপাদনকারীর মালিকানাধীন ওড়িশার কয়লাখনি থেকে প্রতিদিন ৪০০-৫০০ বার কয়লাভর্তি ট্রাক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের জন্য গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করবে।

যাই হোক, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মূল প্রসঙ্গ হল ILR প্রকল্প গত ডিসেম্বর (২০২১) মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ৪৪, ৬০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, ৮ বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। এমনই সিদ্ধান্ত। কর্তৃপক্ষের দাবি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বুন্দেলখণ্ডের সেচের জন্য জল পাওয়া যাবে, পানীয় জল পাওয়া যাবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণও সম্ভব হবে।

কিন্তু বন্য প্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরের অনুমোদন, পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদন, অরণ্যাঞ্চল সংরক্ষণ দপ্তরের অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। আশঙ্কা, সব কিছুকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হয়ত কেন-বেতওয়া নদী সংযুক্তিকরণের (KBLP) কাজ শুরু হয়ে যাবে।

উদ্বেগের বিষয়, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার জঙ্গিবাদীদের মতো যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি জনগণের অগোচরে রেখে নদী সংযুক্তিকরণের প্রকল্পের (ILR) যে কাজ শুরু করতে চলেছে, KBLP র কাজ তারই প্রথম পদক্ষেপ। সারা দেশ জুড়ে এই প্রকার আরও ২৯টি প্রকল্পের কাজ শুরু হলে, ভারতের মাটিতে নির্মিত ILR প্রকল্প হতে চলেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অকল্পনীয় বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত বৃহত্তম প্রকল্প।

শঙ্কাজনক ঘটনা, এমন এক বিপুল প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিক সমাজ, গণ সংগঠন বা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি, গুটি কয়েক সংবাদ পত্রে ILR প্রকল্প সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ, কয়েকটি সেমিনারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সরকারি উদ্যোগ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন এক বিশাল প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পিত প্রায় নৈঃশব্দ্যকে মান্যতা দেওয়া যায় না।

এমন মারাত্মক প্রকল্পের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে—জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে। নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়নে যে বিপুল সংখ্যক মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হবে তার ক্ষতিপূরণ কার্যত অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের যে বিপর্যয় হবে, যে বিপুল সংখ্যক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হবে, সর্বোপরি বিপর্যস্ত ভূপ্রকৃতি যে বিপদ ডেকে আনবে তার ক্ষতিপূরণই বা কী ভাবে হবে? এছাড়াও আরও অসংখ্য সমস্যা আছে। জলের সংকট নিরসনের অবশ্যই সমাধান অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনও Magic বা যাদু নেই। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ের বদলে সমঝোতা করে, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ না করে অর্থনীতিগত বিচারে স্থিতিশীল প্রকল্পের কথা ভাবা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, ILR প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন আনুমানিক ৫,৬০,০০০ কোটি টাকা। প্রাথমিক হিসাব মোতাবেক, শেষ পর্যন্ত অবশ্য আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই ঐতিহাসিক প্রকল্পে মোট ব্যয় গিয়ে দাঁড়াতে পারে এর পাঁচগুণ অর্থাৎ ২৫,৬০,০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম কর্পোরেট সংস্থাগুলি এবং আম্বানি আদানিদের আর্থিক বিনিয়োগের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষ।

বলাবাহুল্য, এককথায় ILR প্রকল্প হতে চলেছে ভারতের মাটিতে জনগণের উপর উদারনীতিবাদের তীব্রতম ভয়ঙ্কর এক আক্রমণ।

## ভারতে কর্মসংস্থান?

গত কয়েকমাস ধরেই ভারত সরকারএবং সরকারের অনুগত প্রচার মাধ্যম লাগাতার বলে চলেছে, ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার পুরানো জায়গায় ফিরে এসেছে। অবশ্য চাকরীর বাজার সম্পর্কে এদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। যদিও কর্মহীনতার হার বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরেই। কর্মহীনতার হার ২০১৮-২০১৯ (৬.৩ শতাংশ) এর তুলনায় ডিসেম্বর ২০২১ সালে বেড়ে ৭.৯১ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৭-১৮ সালে কর্মহীনতার হার ছিল ৪.৭ শতাংশ। ঐ বছর থেকেই কর্মহীনতা বৃদ্ধির হারের প্রবণতা শুরু হচ্ছে, অর্থাৎ কেবলমাত্র কোভিড-এর জন্য এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা যাবে না। ২০২১ ডিসেম্বরে শহরাঞ্চলে কর্মহীনতার হার ছিল ৯.৩০ শতাংশে। শহরাঞ্চলে জানুয়ারি ২০২১ সালে এই হার ছিল ৮.০৯ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার হার এই সময়কালে ৫.৮১ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.২৮ শতাংশে। স্পষ্টতই কর্মহীনতার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলেই বেশি। ২০১৯-২০ এবং ২০২১-ডিসেম্বরের নির্মাণ শিল্পে ৯৮ লক্ষ চাকুরীজীবী কাজ হারিয়েছে। তুলনায় গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান ৫.৮১ শতাংশ থেকে ৭.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরাঞ্চলে কাজের জন্য বেতন বেশি হলেও মানুষের গ্রামে ফিরে যাওয়ার প্রবণতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বেতনভুক চাকুরীজীবির সংখ্যা ২১.২ শতাংশ (২০১৯-২০) থেকে ২০২১ সালে ১৯ শতাংশে নেমেছে। অর্থাৎ ৯৫ লক্ষ চাকুরীজীবি নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক চাকুরীজীবি বেকার হয়েছে অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। সেখানেও সার্বিক পরিস্থিতি খুব আশাব্যঞ্জক নয়। সব মিলিয়ে ২৯ লক্ষ চাকুরীজীবি এই সময়কালে বেকার বা কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

একশ্রেণির অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সরকারি (পরিকাঠামো এবং জনকল্যাণ খাতে) এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়লেই কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

২০১১ সাল থেকে বিনিয়োগের হার ৩৪.৩ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে। আসলে ব্যাপক কর্মহীনতা এবং চাহিদার অভাবের জন্যই বিনিয়োগের হার কমছে। এতো সরল অঙ্ক। চাহিদা না থাকলে অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য কেনার মতো মানুষ না থাকলে বিনিয়োগকারীরা কোন ভরসায় বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন? ক্রমবর্ধমান অসাম্য এবং ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণি বিনিয়োগের গাঙে জোয়ার আনতে পারছে না। তাছাড়া গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি NPA এর বোঝায় প্রায় জরাগ্রস্ত। আগামী দিনে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫ শতাংশে পৌঁছে যাবে, অতএব সুদের হারও বাড়তে চলেছে। সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্কে সুদের হার হয়েছে ৫ শতাংশ। অতএব ইচ্ছে থাকলেও বিনিয়োগকারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটা বাড়াতে পারবেন বলা মুস্কিল।

অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য, কর্মহীনতার হার ভারতে এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং সরকার এবং প্রচার মাধ্যম যতই ঢাকঢোল পেটাক না কেন, এই পরিস্থিতিতে সার্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতা কত দূর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে, তা বলা যাবে না।

# শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠন ঃ কি এবং কেন

*পূর্ববর্তী সংখ্যার শেষাংশ*

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

(৪)

এই প্রবন্ধে আমি শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার জায়গাগুলির তালিকা নির্ধারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। একটি মৌলিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা থেকে সরকারের বিচ্যুতির বিষয়ে শিক্ষাবিদ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যথেষ্ট মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাণগত বিস্তৃতি যথেষ্ট ঘটেছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রাথমিক থেকে ক্রমশ যত উচ্চতর শিক্ষার পরিসর আছে সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তারের সুযোগ কারা পাচ্ছে, কোন শ্রেণির ছাত্ররা পাচ্ছে সেটাই বিচার্য বিষয়।

কোনো সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাপকাঠি বিচারের ক্ষেত্রে শিক্ষার সমাজতত্ত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়টি এতই সোজাসাপ্টা এবং খোলামেলা যে অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটা সহজেই ধরা পড়ে। শুধু এই কারণেই শিক্ষার পরিসরে ক্ষমতাশীল শ্রেণির একচেটিয়া আধিপত্য এবং সার্বিক নিয়ন্ত্রণ।

শ্রদ্ধেয় জে পি নায়েক তাঁর ১৯৬৪-৬৬ সালে প্রস্তুত রিপোর্ট অফ দি এডুকেশন কমিশনে সেই প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন, ''স্বাধীনতাউত্তর ভারতে শিক্ষার প্রসারের সুযোগ কারা কোন শ্রেণির মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি পেয়েছে?'' তিনি লিখেছেন, ''প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ এখনও সমাজের দুর্বলতম শ্রেণি খুবই সামান্য পাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমতার অধিকার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং উচ্চমাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে ক্রমশ সামাজিক স্তরের উচ্চতর অবস্থানের ছাত্রদের অধিকারে চলে গিয়েছে।'' তাঁর রিপোর্টে এই চিত্রটি সুস্পষ্ট। তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত, ''দেশের প্রতিটি ছাত্রকে উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার বদলে, ন্যূনতম ক্ষেত্রে প্রতিটি সমর্থ ছাত্রকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা না করে উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের অর্থাৎ সমগ্র ছাত্র সমাজের সামান্য অংশকে একটি অগণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা হয়েছে মাত্র। অর্থনৈতিক ভাবে সমর্থ অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা 'ক্রয়' করার সুযোগ পাচ্ছে।''

'সাংখ্য : দি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ স্ট্যাটিস্টিকস্' এ পরিকল্পনা কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত মহলানবীশ এবং জে পি নায়েকের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করেছেন, ''যে শ্রেণির হাতে ক্ষমতা ও অর্থ আছে তাদের সংখ্যা খুবই কম, সম্ভবত দুই বা তিন শতাংশ। উচ্চশিক্ষার সুযোগ যেমন কম, তেমনই উন্নতমানের শিক্ষার বাজারদরও খুব চড়া। বলা যেতে পারে যারা এই ধরনের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পায় তারাই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মানের জন্য ''ভালো চাকরি এবং উচ্চপদে বহাল হতে পারে।'' মহলানবীশ স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্য এবং ক্ষমতা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাগত মান উচ্চতর করা এবং উচ্চপদের সরকারি/বেসরকারি চাকরির যোগ্যতা বলে গৃহীত হয়।

গানার মিরডাল তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ এশিয়ান ড্রামায় কোনো রাখঢাক না করেই বলেছেন, ''বৈষম্যমূলক সমাজে শিক্ষার উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং বৈষম্য সৃষ্টি একটি মৌলিক এবং একচেটিয়া বিষয়। ...ভারতে এই উপাদানটি ভীষণই প্রকট। শিক্ষার উপর উচ্চতর শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি করে।''

সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের জাতীয় লক্ষ্য (সংবিধানের ৩৮তম ধারা) ''সমস্ত প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক জীবনচর্যায় সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিসরে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।'' কিন্তু এদেশে অতিধনিক শ্রেণির ছাত্রদের পঠনপাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দেরাদুন, লাভডেল, মায়ো কলেজ প্রভৃতি অতি উচ্চমানের প্রচুর ব্যয়যোগ্য স্কুল কলেজগুলির প্রসার কি শাসক শ্রেণির ঘোষিত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সুতরাং সমাজতন্ত্রের গালভরা বুলি এবং জাতীয় শিক্ষানীতির পবিত্র প্রতিজ্ঞা চূড়ান্তই অন্তঃসারশূন্য ঘোষণা। শিক্ষার শ্রেণিবৈষম্যই চরম বাস্তবতা।

(৫)

এতদসত্ত্বেও ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি রেজোলিউশনের আহ্বান 'শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠনের আহ্বান যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের নীতিপ্রণেতাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই মূল্যবান প্রবাদবাক্য ''যতই সমস্যার গভীরে যাবে, ততই তুমি মৌলিক রূপান্তরের জন্য দায়বদ্ধ হয়ে উঠবে।'' ভারত সরকার কি শিক্ষার এই ভয়ঙ্কর নির্লজ্জ বৈষম্যের শেকর উপরে ফেলায় প্রয়াসী হবে? সামাজিক বৈষম্যের আর্থসামাজিক ভিত্তি অন্বেষণে ব্রতী হবে?

সরকারি প্রশাসন ও নেতৃত্ব, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী প্রমুখ অনেকেই বারংবার দেশের সমগ্র শিক্ষা কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠনের কথা বলেছেন, আজও বলছেন। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হবে? বর্তমান সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে তা কি সম্ভব? অথবা আমাদের কি কোনো বিকল্প পথের সন্ধান করতে হবে, যাতে এই ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করা যায়? এর উত্তর আছে আমদের মানসিকতা ও আদর্শের গঠনে তথা সামাজিক দায়বদ্ধতায়।

**'দি কল' জুলাই '১৯৭২-এ প্রকাশিত**

# রাজ্য নির্বাচন কমিশনে বামফ্রন্টের দাবি

তেইশে ফেব্রুয়ারি রাজ্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে নিম্নলিখিত দাবিনামা নিয়ে আলোচনা করে। আরএসপি'র পক্ষ থেকে কম. দেবাশিস মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন।

**প্রতিবেদন ঃ ১০৮টি পৌর-সভায় অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।**

১। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিগত ৫টি পৌরনিগমের ভোটের সময় বারে বারে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে নির্বাচনগুলি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অবাধে ভোট লুঠ হয়েছে—রাজ্য নির্বাচন কমিশন কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

২। ১০৮টি পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা অনেক বাম প্রার্থীদের অপহরণ এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য জোর করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে। ফলস্বরূপ ইতিমধ্যে দিনহাটা, বজবজ, সাঁইথিয়া ও সিউড়ি—৪টি পৌরসভা এবং ২২৭২টি আসনের মধ্যে ৯৯টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। এখন এই সমস্ত দুষ্কৃতীরা বিরোধী প্রার্থীদের প্রচারে জোর করে বাধা সৃষ্টি করছে, বুথ অফিস, পার্টি অফিস ভাঙচুর করছে। এককথায় ভোটার সহ সাধারণ মানুষের মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া (Reign of Terror) তৈরি করছে। জরুরি ভিত্তিতে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন কমিশনকে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। বিগত পৌরনিগমগুলির নির্বাচনে ভোটের দিন বুথে বুথে সিসি টিভি ক্যামেরাকে বন্ধ করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা অবাধে ভোট লুঠ করেছে। ২য় পর্যায়ের নির্বাচনে বিশেষত বিধাননগর এবং আসানসোলে যেভাবে মারধর- বলপ্রয়োগ করে শাসক দল ভোট লুঠ করেছে যা শুধু আমাদের করা অভিযোগ নয়—বৈদ্যুতিনসহ সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে তা প্রদর্শিত হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনকেই করতে হবে।

৪। পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে বামফ্রন্ট বারে বারে দাবি জানিয়ে আসছে—ওয়ার্ডের যে কোনো ভোটার সেই ওয়ার্ডের যে কোনো বুথে পোলিং এজেন্ট হতে পারবেন, কমিশনের ২০২১ সালের এই নির্দেশিকা অনুযায়ী এজেন্ট নিয়োগ করার সুযোগ দিতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পুনরায় আমরা দাবি জানাচ্ছি।

৫। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত বহিরাগতদের নির্বাচনে যুক্ত এলাকায় প্রবেশ নিষেধ করতে হবে। পুর এলাকার সীমানা সিল করতে হবে। বহিরাগতরা যাতে কোনো হোস্টেল, অতিথিশালা বা অন্য কোনো স্থানে সেই ৪৮ ঘণ্টা থাকতে না পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। Silence Period-এ বিরোধী দলগুলির প্রার্থী, নির্বাচনী ও পোলিং এজেন্টদের শাসক দলের নির্দেশে ভয় ভীতি প্রদর্শন ও এমনকি, প্রচার বন্ধ রাখার কাজে পুলিশের একাংশের (বিশেষ করে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক) অতিসক্রিয়তা বন্ধ করতে হবে। ভোটের কাজে নিযুক্ত দাগী অফিসারদের আসন্ন ভোটে কোনো দায়িত্ব অর্পণ বন্ধ করতে হবে।

৭। ভোট দেওয়ার সময় ভোটারদের EPIC-সহ রাজ্য নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত বিকল্প পরিচিতি পত্রগুলি যেন কঠোরভাবে দেখা হয়। সম্প্রতি বিগত নির্বাচনগুলিতে পোলিং অফিসাররা ভোটারদের কোনো পরিচিতিপত্র না দেখেই ভোট দিতে দিয়েছেন। ফলে অবাধে ভোট লুঠ হয়েছে। ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে EPIC অথবা রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশিত বিকল্প সঠিক পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটারদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আশা করি, আপনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে, ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে আপনার সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

# কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অতিমারির সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ

কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়ে দেশের অধিকাংশ মানুষ, বিশেষ করে প্রান্তিক জনতা শুধু কাজই হারায়নি, সরকারি অপদার্থতায় খাদ্য সুরক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। একটি প্রখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি (রাইট টু ফুড ক্যাম্পেইন) 'দি হাঙ্গার ওয়াচ সার্ভে-২'র এর সমীক্ষায় সেই বঞ্চনার ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে।

গত বছর ডিসেম্বর থেকে এবছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কালে করা সমীক্ষায় জানা গেছে দ্বিতীয় ঢেউ-এর শীর্ষ অবস্থানের সময়ে সমীক্ষার আওতায় যাদের আনা হয়েছিল তাদের ৪১ শতাংশই উন্নতমানের নিউট্রিয়েন্টের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

৬০ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে তারা খাবার সংগ্রহ, উন্নতমানের খাবারের জোগান এমনকি প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার পাওয়া যাবে কিনা, অতিমারির সময়ে এই দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করার তিন চার মাস সময়কালে এই ধরনের খাদ্যনিরাপত্তা জনিত দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তা শুধু নয় বাস্তবে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল।

সমীক্ষার আওতায় ৬৬৯৭ জন ব্যক্তির ৩৪ শতাংশ জানিয়েছে যে, দানা শস্যের সে রকম অভাব অনুভূত হয় নি। ৫০ শতাংশ মাসে খুব বেশি হলে ২।৩ বার প্রয়োজনীয় ডিম দুধ মাছ মাংস ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণ খেতে পেয়েছে।

এককথায় বলা যায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যে অতিমারির কালে যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ ও বন্টনের মাধ্যমে জনসাধারণকে খাদ্যসুরক্ষা দিয়েছে— এই ধরনের প্রচার কার্যত ডাহা মিথ্যা এবং শূন্যগর্ভ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্টে সেই ভয়াবহ ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

২০২০ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ অতিমারির প্রথম পর্যায়ে করা হাঙ্গার ওয়াচ সার্ভের প্রথম পর্যায়ে খাদ্য সুরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চনার ছবিটা ছিল চরম ভয়ানক। ৭১ শতাংশ মানুষই প্রয়োজনীয় মান ও পরিমাণের খাদ্য জোগাড় করতে ব্যর্থ। অন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইকুইটি স্টাডিজ প্রথম পর্যায়ে রাইট টু ফুড ক্যাম্পেইন-এর সঙ্গে যৌথভাবে সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় ঢেউ চলাকালীন সময় ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন ভোটের বাজারে রাজ্যের উন্নয়ন ও অতিমারি

এরপর ৮ পাতায়

# “বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে”

বিচারের বাণী আজও কাঁদছে। প্রতিকারহীন শক্তের অনাবৃত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। সন্তানহারা পিতার বুকফাটা আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে, তবু শাসকদের হুঁশ নেই। ঘাতকের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আবিল আকাশ। প্রতিবাদের কণ্ঠগুলোকে এমনি করেই একে একে টুঁটি টিপে চুপ করিয়ে দেওয়ার এই সর্বনাশা খেলার কী ভয়াবহ রূপ দেখছি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে?

সংবাদ মাধ্যমে, টেলিভিশনের চ্যানেলে, টগবগে ছাত্রনেতা আনিস খানের নারকীয় হত্যার বিবরণ জেনে শিউরে উঠছি। অভিযোগ, পুলিশের পোশাক পরে পৈশাচিকতা, পরিকল্পিত হত্যা হয়েছে... তিনতলার ছাদ থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে।

আনিসের বাড়ি, হাওড়া জেলায় আমতার এক গ্রামে। সে সোজাসাপ্টা, সরল, গ্রামের ছেলে। তবু আর পাঁচটা ছেলের থেকে আনিস একটু আলাদা। সে বিবেকবান এবং রাজনীতি সচেতন; সামাজিক অন্যায়ের, মানবিক অবমাননার, রাষ্ট্রিক অবিচারের বিরুদ্ধে নীরব না থেকে সে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। আনিস আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ও মেধাবী ছাত্র ছিল। সদ্য প্রাক্তন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি এবং অনাচারের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল আনিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি ছাত্রদের না জানিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে, ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ ও ছেলেমেয়েদের হস্টেল সমস্যা নিয়ে বারবার সোচ্চার হয়েছে। ছাত্রদের লড়াইকে আনিস একটি সুচিমুখ ও সংগঠিত চেহারা দিতে পেরেছিল বলে তার পেছনে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সোৎসাহ সমর্থন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বাভাবিক ভাবেই আনিসের আন্দোলনে বিরক্ত ও বিড়ম্বিত, রাজশক্তি অখুশি এবং তাদের অনুগত ছাত্রদলও ক্ষিপ্ত। আনিস মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি প্রার্থীদের ধর্ণামঞ্চে গিয়ে সমর্থন সহ আর পাঁচটা সরকার বিরোধী আন্দোলনেও নৈতিক সমর্থন জানাতো।

কেন্দ্রীয় সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতাতেও আনিস ছিল সমান অকুণ্ঠ। এন আর সি এবং নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণের অশুভ উদ্যোগের বিরুদ্ধে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানের অবস্থান আন্দোলনে তাকে প্রায় প্রতিদিনই দেখা গেছে। আনিস বিগত বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড় কেন্দ্রের আই এস এফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকীর হয়ে প্রচারও করেছে। খবরে প্রকাশ, তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বারবার। ফলে ঘরবাড়ি ছেড়ে আনিস অজ্ঞাতবাসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। পুলিশকে খুনের হুমকির কথা লিখিতভাবে সে জানিয়ে ডায়েরি পর্যন্ত করেছে। ২০২১ সালের ২৪ মে আনিস লিখিতভাবে আমতা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল। থানা সেটিকে এফ আই আর হিসেবে গণ্য করে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযোগ করার পরিণতিতে কিছু দিনের মধ্যে আনিসের বাড়িতে তৃণমূলের গুন্ডারা হামরা চালালো। আনিস সেই সময় বাড়িতে ছিল না। দুষ্কৃতীরা আনিসের বাড়ি ভাঙচুর করে এবং মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। আনিসের বৌদি আবারও আমতা থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাতে যায়। এবার থানা অভিযোগ জমা না নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর আনিস উদ্যোগ নিয়ে থানা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ডাকে চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতে নির্দিষ্ট করে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু নিষ্ফল সে ক্রন্দন। পুলিশের তরফে কোনো পদক্ষেপই করা হয় নি। আনিসের জীবনহানির আশঙ্কা ছিল। সেকথা পুলিশকে আনিস জানিয়েছিল। তবু তাকে মরতে হলো। নির্মম মৃত্যু, অভাবনীয় অবসান। শেষ রক্ষা হলো না।

আনিস খানের রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের জানা নেই। লাল সবুজ গেরুয়া বা অন্য কোনো রঙের মাটিতে সে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের বীজ পুঁতিছিল তা জানা আদৌ জরুরি নয়। যেটুকু জানা গেছে, তা হলো সে প্রতিবাদী ছিল, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখর ছিল। তাই অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আমাদের রাজ্যেও পরিসর ক্রমেই সংকুচিত ও ছোটো হয়ে আসছে। প্রতিবাদীদের জীবন ও নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, গণতান্ত্রিক সমালোচনার সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। বিরুদ্ধতা গণতন্ত্রকে বলবান করে, তা সহ্য করতে না পেরে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে, যেখানে প্রতিবাদ জানানোর কোনো পরিসর নেই। আরও অবাক হচ্ছি, তিনদিন পরেও পুলিশ খুনের কোনো কিনারাই করতে পারলো না। এ পর্যন্ত একজনও গ্রেপ্তার হলো না। পুলিশের ডিজি স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি পুলিশের পোশাকে যারা এসেছিল তারা পুলিশ নয়। তবে তারা কারা, কেন এলো, কে পাঠালো?

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আনিসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আনিস তাঁর ফেবারিট ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর অনেক অসত্য কথার মধ্যে এটাও একটা। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী অবাক করে দিয়ে বলেছেন, কেউ বুঝে এরকম কাজ করে না। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চেয়েছেন এটা অনিচ্ছাকৃত খুন? তিনি জানলেন কি করে এটা আমাদের প্রশ্ন। খুনিদের সঙ্গে তার কি কথার আদান প্রদান হয়েছে? এই ধোঁয়াশা কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিন। গোটা রাজ্যের নাগরিক সমাজ এই দাবি জানাচ্ছে।

অবাক হওয়ার আরও কারণ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে যাচ্ছেন কলকাতার একটি টিভি চ্যানেলের মালিক। গণতন্ত্রের পক্ষে এর থেকে লজ্জার দিন বোধহয় আর আসেনি। সেই চাকরি এবং সাহায্য দিয়ে বিষয়টিকে ধামা চাপা দেওয়ার নির্লজ্জ প্রয়াস। আশার কথা আনিসের বাবা দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই অপচেষ্টার নিন্দা করছি।

ইতিমধ্যে জ্ঞানবন্ত সিংকে প্রধান করে সিট গঠন করা হয়েছে। এই তদন্তের উপর মানুষের কোনো ভরসা নেই। উর্দিতে দাগ লাগা একজন পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে নিরপেক্ষ তদন্ত আশা করা যায় না। আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা যার উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারে। তবে এর মধ্যেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। গত কয়েকদিন আমতা থেকে কোলকাতায় হাজার হাজার ছাত্র যুব সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আতস বাজির নানা রঙের ফুলঝুড়ি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ছাত্র যুবদের দুর্দমনীয় জেদ আনিসের পরিবারের জন্য, সমস্ত প্রতিবাদী মানুষদের জন্য ন্যায় বিচার আদায় করে আনতে পারে।

আমাদের ‘ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে’ লুপ্ত ও নিমজ্জিত হয়ে যাবে এ বাংলার মানুষ কিছুতেই মেনে নেবে না। যারা অনবরত, অবিরাম আমাদের বসবাসের বিশ্বের বায়ু বিষিয়ে ও আলো নিভিয়ে চলেছে, তাদের ক্ষমা নেই। রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। রাস্তাতে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে লড়তে হবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।

**No Passaron স্বৈরাচারীদের পথ ছেড়ে দেওয়া হবে না।**

**সেভ ডেমোক্রেসি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেদন।**

# আনিস খানকে পূর্ব পরিকল্পনা করেই নৃশংস খুন

*১-এর পাতার পর*

ময়না তদন্তের ছল অনুষ্ঠিত করে ১৯ ফেব্রুয়ারিই আনিসের মৃতদেহ পরিবারের কাছে দিয়ে যায় পুলিশ। অশ্রুসিক্ত পরিবার পরিজনরা অসহায়। সেদিনই আনিসের মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিভীষিকাময় রাত্রে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে পুলিশবেশী তৃণমূলী ঘাতকদের নিষ্ঠুর আক্রমণে নির্মমভাবে নিহত হবার প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে স্থানীয় পুলিশদের নিয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃতের বাড়ি পৌঁছে তদন্ত করার ছল করেন। এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবার পরে কতিপয় বিশেষজ্ঞ আর কী করতে পারেন? মৃতদেহ সৎকারও করা হয়ে গেছে। মৃতের ক্ষতস্থানগুলি দেখার কোনও অবকাশও তখন ছিল না। শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য তদন্তকারীরা পৌঁছে তিনতলার ছাদ থেকে একটি কোলবালিশ বারবার বস্তায় ছুঁড়ে ফেলে কিছু হয়তো বোঝার চেষ্টা করেছেন! যেই স্থানে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃতদেহটি ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল সে নির্দিষ্টস্থানটি যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত করাও হয় নি। তিনতলার যেই স্থানে গুপ্তঘাতকরা আনিসকে আচমকা আক্রমণ করে হত্যা করে সেই স্থানেও কতটা নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে তাও গভীর সন্দেহের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ, রাজ্য পুলিশের একান্তভাবে তদন্তে সদিচ্ছা ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হয় নি। সালেম খান ন্যায়সংগত ভাবেই সিবিআই তদন্ত দাবি করেন।

গ্রামের মানুষের বিশাল অংশ পুলিশের এহেন আচরণে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। পুলিশের উপস্থিতি তাঁদের কাছ বিষময় বলে প্রতীত হয়। উল্লেখ্য যে, আনিসের বাড়ির কাছে একটি ক্লাবে সি সি টিভি'র ক্যামেরা ছিল। ঘাতকরা সেই স্থানটি সযত্নে এড়িয়ে আনিসের বাড়িতে পৌঁছেছিল এবং একইভাবে নৃশংস হত্যা সংঘটিত করে পালিয়ে যায়। তারা সম্ভবত বেশ প্রস্তুতি নিয়েই এমন হত্যাকাণ্ড দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি নিয়েছিল। বাড়ির আশেপাশে কি আছে তা নিশ্চিতই তাদের জানা ছিল।

সেদিন রাতে গ্রামের মানুষরা অনেকেই ধর্মীয় জলসায় সামিল হয়েছিলেন। আনিসও নাকি সেই অনুষ্ঠানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন। ঘাতকরা বৃদ্ধ পিতা সালেম খানকে নাকি বলেছিল যে, আনিস বাড়িতে ফিরে এসেছে এবং বাড়িতেই আছে। প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধ জানতেন না যে, তাঁর ছোট ছেলে জলসা শেষে বাড়িতে ফিরে এসেছে। প্রতিবেশীরা অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, খুনী পুলিশরা বেশ কিছুক্ষণই জলসা অনুষ্ঠানে আনিসের উপস্থিতি লক্ষ করেছে এবং সে বাড়ি ফিরে আসার পনের কুড়ি মিনিট পরে নিশ্চিত হয়েই বাড়ির কড়া নেড়েছে। অধিক রাত্রে বৃদ্ধ সালেম খান স্পষ্টভাবে না জানলেও খুনীরা বিশদে সবকিছু জেনেই উপস্থিত হয়েছিল। সালেম খানকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নীচে আটকে রেখে তাঁর পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। পুলিশের আধিকারিক কোনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্যতীত কোনও অপরাধীর বাড়িতে এভাবে হানা দিতে পারে না। দেশের আইনের বিধানে এমন করা যায় না। গ্রামের সাধারণ মানুষ আইনের এমনসব ধারা বা বিধির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত না থাকাটাই স্বাভাবিক।

গ্রামীণ সরল ও অসচেতন মানুষের ওপর পুলিশী অত্যাচার এরাজ্যে এখন আর অভিনব কিছু নয়। সংবিধান কিংবা দণ্ড সংহিতার কোনও পরোয়া করে না স্বৈরাচারী রাজ্য সরকার। এই প্রশাসনের গর্হিত অপরাধমূলক কাজ কিছুটা আটকানোর জন্য যে মানবাধিকার কমিশন রাজ্যে ক্রিয়াশীল থাকলে কিছুটা সুরাহা হত, তাও এই জমানায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে হ্যাঁ মিলিয়ে চলা স্তাবকরাই আপাতত মানবাধিকার কমিশনের শীর্ষে। পুলিশের বড়কর্তা হিসেবে বহুবার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা এক পুলিশ আধিকারিককে যদি মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে রাখা হয় তাহলে, কোনও সুবিচার আশা করাও বাতুলতা। সর্বক্ষেত্রেই চূড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতি চলছে। আর রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী সেজে নবান্নে বসে যেমন তেমন মিথ্যার চরম বেসাতি করে চলেছেন। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদি যা করছেন তাই তৃণমূল নেত্রীও করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনজীবন এখন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত। মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিরাপত্তাহীনতায় পর্যুদস্ত। এ রাজ্যে মধ্যরাতেই শুধু নয়, দিনে দুপুরে বা প্রকাশ্য দিবালোকেও মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। নিহত ব্যক্তির ওপরে অনেক সময় দায় চাপিয়ে পুলিশ প্রশাসন নিজেদের কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করছে। সার্বিক পরিস্থিতি দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

এই ধরনের এক নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতিতে আনিস খানের মতো এক প্রতিবাদী যুবকের নৃশংস হত্যা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। রাজ্যে আইন শৃংখলা নেই বললেই চলে। মমতা ব্যানার্জী মুখে যতই বড়ো বড়ো কথা বলুন, তিনি নিজেই এখন রাজ্যের নিকৃষ্টতম গুন্ডাদের নিয়ন্ত্রণে। এ থেকে সরে আসার চেষ্টা করলে তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়বে। যেভাবে এই দলটি গ্রামে গ্রামান্তরে নিরন্তর গুণ্ডাগিরি করে পঞ্চায়েতী ক্ষমতা দখল করেছে তা থেকে সরে যাবার কোনও সম্ভাবনাই আপাতত নেই। এখন চরম সমাজ বিরোধীরা শহরে ও গ্রামে গণতন্ত্রের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করে একান্তভাবে নিজেদের মৌরসীপাট্টা স্থাপন করেছে, তাদের ক্ষমতাহীন করতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গ আর বাঁচবে না। মমতা ব্যানার্জীর জমানায় যে চরম দুর্নীতি রাজ্যের সমাজ মানসকে আচ্ছন্ন করেছে তা এখন প্রায় অপ্রতিরোধ্য অবস্থায়।

আনিস খানের মর্মান্তিক পরিণতি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজ্যের যে কোনও সুস্থ বোধসম্পন্ন মানুষেরই যে কোনও সময় এমন করুণ পরিণতি হতে পারে। এখনও শুভবোধসম্পন্ন সমস্ত নিপীড়িত মানুষ পারেন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের প্রাচীন তুলে এই অপশাসন থেকে জীবনকে মুক্ত করতে।

# ইউক্রেন সঙ্কটে জার্মানীর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য

দিলীপ গোস্বামী

বিশ্বরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই মুহূর্তে যাবতীয় উত্তেজনার ভরকেন্দ্র ইউক্রেন, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ। ইউক্রেন সীমান্তে মোতায়েন আধুনিক যুদ্ধের সব সরঞ্জাম নিয়ে ১,০০,০০০ মতান্তরে ১,৭৫,০০০ রাশিয়ান সেনা, যেন ক্রেমলিন থেকে ইউক্রেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় রয়েছে। ইউক্রেনের অভ্যন্তরে ঐ রাষ্ট্রের সেনারাও বসে নেই। চলছে যুদ্ধের মহড়া, আত্মরক্ষার জন্য খোঁড়া হচ্ছে ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার। এদিকে ইউক্রেন সংলগ্ন পোল্যান্ডে ন্যাটো বাহিনীও পিছিয়ে নেই। একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। এমনকি, পারমাণবিক হামলার কথাও শোনা যাচ্ছে, পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের বয়ান অনুযায়ী রাশিয়া হুমকি দিচ্ছে ইউক্রেনের ন্যাটোর সদস্যপদের আবেদন খারিজ না হলে ইউক্রেন আক্রান্ত হবেই। ইউক্রেন সঙ্কটের প্রতিফলন ইউরোপীয় অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। চিন সংলগ্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাইওয়ান আতঙ্কিত। চিন ইউক্রেন সঙ্কটের পরিণতির দিকে নজর রাখছে। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চিনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চিন যে কোনও সময় তাইওয়ানের দখল নিতে পারে। মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনা— রাশিয়া যখন ক্রিমিয়াকে ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং দখল নেয় পশ্চিমী দুনিয়া, ন্যাটো জোট বা সাগরপারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উচ্চবাচ্য করেনি, তাদের নীরবতা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়করই ছিল। রাশিয়ার সম্ভাব্য ইউক্রেন অভিযানের পর তাইওয়ানবাসীরও কী একই অভিজ্ঞতা হবে? দ্বীপ রাষ্ট্র তাইওয়ান চিনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে? ক্রিমিয়ায় রাশিয়ান সেনা অভিযানের পর ন্যাটো বাহিনীর নীরবতা রাজনৈতিক বিশ্লেষণকদের কিছুটা অবাকই করেছিল, ইউক্রেন এবং তাইওয়ানের পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য আছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ইউক্রেনকে রাশিয়া তার প্রভাব বলয়ের অন্তর্গত অঞ্চল বলেই মনে করে। চীনও তাইওয়ানকে চিনের অংশ বলেই মনে করে। তাই চিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হবেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় বড় সড় সংঘর্ষ এড়াবার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি দুনিয়াটাকে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করে নিয়েছিল ইয়াল্টা কনফারেন্সে, চার্চিল, ট্রুম্যান এবং স্তালিনের মধ্যে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তিও সম্পাদিত হয় বৃহৎ শক্তির প্রভাবিত এলাকা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর অবশ্য প্রভাবাধীন এলাকার ইতিহাস ধূসর স্মৃতিতে পর্যবসিত হলেও, রাশিয়ার পুতিন সেই ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন। রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিনের দাবি রাশিয়ার নিরাপত্তার পরিকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ইউক্রেনকে মেনে নিতে হবে এবং ইউক্রেনকে ন্যাটো জোটের সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না। আপাত বিস্মৃত ইয়ালটা কনফারেন্সের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত সম্পাদিত চুক্তির কথাই পুতিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি কাজাখস্তানে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন দমনে সাহায্য করার জন্য কাজাখস্তানের সরকারের আমন্ত্রণে ঐ প্রভাবাধীন এলাকা সম্পর্কিত চুক্তির কথা মাথায় রেখেই রাশিয়ান সেনা কাজাখস্তান অভিযান করে। রাশিয়ার দাবি ইউক্রেন 'ন্যাটো'র সদস্যভুক্তুক্ত হলে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। এই দাবি থেকে রাশিয়াকে সরানো মনে হয় কার্যত অসম্ভব। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ন্যাটো জোটকে সামাল দেওয়ার জন্য রাশিয়ার উদীয়মান শক্তি চিনের সহযোগিতার বড্ড প্রয়োজন। ভাবতে অবাক লাগে বিগত ষাট বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। পরিস্থিতির চাপে চিন রাশিয়া ফের কাছাকাছি এসেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক ভিডিও কনফারেন্সে পুতিন জিন পিং-এর কাছে রাশিয়ার নিরাপত্তার স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কার কথা বলেন। এই বিপদের উৎস মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। পুতিনের এই লড়াইয়ে জিন পিং পুতিনকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পুতিনের মূল দাবি ন্যাটো শক্তিকে প্রাক্তন সোভিয়েতের রিপাব্লিক ইউক্রেন থেকে সরতে হবে। রাশিয়া বেশ দৃঢ়তার সাথেই পশ্চিমী জোটকে মনে করিয়ে দিয়েছে ইউক্রেনের ন্যাটো জোটের সাথে যুক্ত হওয়াটা রাশিয়ার কাছে অস্তিত্বের সঙ্কটের মতই এক অনভিপ্রেত ঘটনা। পুতিন এবং বাইডেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সে বাইডেন হুমকির সুরেই বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করলে রাশিয়াকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। তীব্রতম নিষেধাজ্ঞা (Sanction) রাশিয়াচার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। পুতিনও পিছিয়ে থাকার পাত্র নয়। যথাযথ সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি সহ রাশিয়া ইটের বদলে পাটকেল ছুঁড়তে পিছুপা হবে না, অতএব টান টান উত্তেজনার পরিস্থিতি আপাতত বিরাজ করছে।

এই হচ্ছে বর্তমান নিবন্ধের মুখবন্ধ মাত্র, ইউক্রেন সমস্যার আসল উৎস অন্যত্র নিহিত, ইউক্রেনের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্কই নেই। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ রাশিয়া ঘোষণা করে বসেছে ইউক্রেন সীমান্ত থেকে আপাতত কিছু সেনা সরিয়ে নিচ্ছে, তাহলে কী লৌহমানব (?) পুতিন ভয় পেয়েছেন। আদৌ তা নয়। পশ্চিমীদের, বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাতা ফাঁদে রাশিয়া পা রাখলে, অর্থাৎ রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করলে মার্কিনীদের পোয়া বারো। আসলে ইউক্রেন নয়, আসল সমস্যাটির নাম NORD STREAM 2, যা সমুদ্রের জলের নীচ নিয়ে রাশিয়া থেকে শুরু করে গ্যাস পাইপলাইন জার্মানী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই NORD STREAM 2 সমুদ্রতলের গ্যাস পাইপ লাইনই হচ্ছে রাশিয়ার সর্বাধুনিক ভূরাজনৈতিক অস্ত্র।

প্রথমত ইউক্রেন এই পাইপ লাইন নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ, এই পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হলে ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান রাশিয়ান গ্যাস রপ্তানি বাবদ বিপুল পরিমাণ Transit fee থেকে ইউক্রেন বঞ্চিত হবে। রাগ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। উপরন্তু, ইউক্রেনের আশঙ্কা যে কোনও মুহূর্তে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে রাশিয়া ইউক্রেনকে বিপাকে ফেলতে পারে। কিন্তু NORD STREAM 2 দিয়ে গ্যাস সরবরাহ চালু হলে রাশিয়ার পক্ষে ইউরোপের বাজারে গ্যাস সরবরাহ চালু রাখতে কোনও অসুবিধাই হবে না।

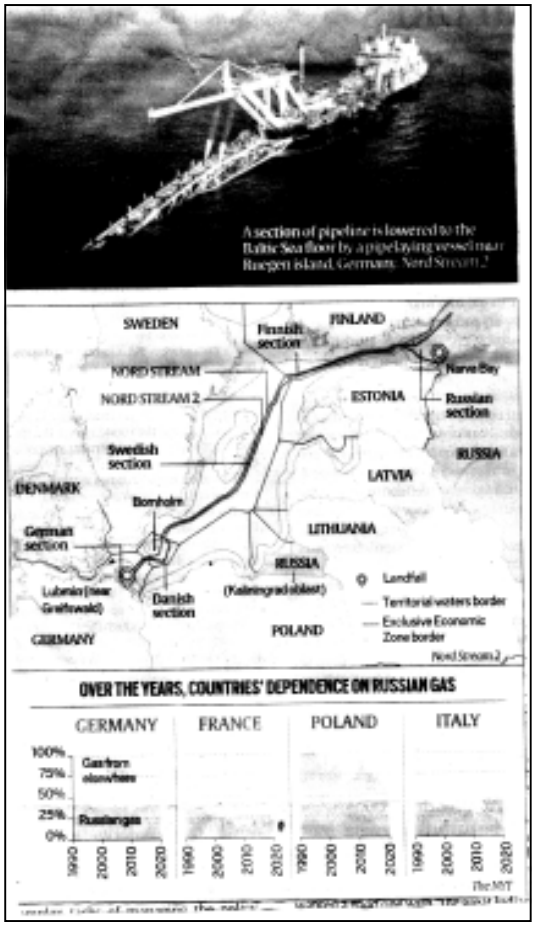


দ্বিতীয়ত, ওয়াশিংটনেরও আশঙ্কা এই গ্যাস পাইপ লাইন ইউরোপের বাজারে তার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার পথে এক বড় কাঁটা হয়ে উঠবে। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়াটা এখনও ওয়াশিংটনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটাই লাগাতার করে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এতদসত্ত্বেও Nord Stream 2 এর কাজ প্রায় শেষ। এখন শুধু জার্মানীর নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (Regulator) চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় এই গ্যাস প্রকল্প। অনুমোদন পেলেই গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে। জার্মানীর নাগরিকরা সস্তায় পরিচ্ছন্ন আরও বেশি গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ পেতে চলেছে এবং রাশিয়ারও গ্যাসের সরবরাহ থেকে আয়ের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জার্মানী এবং রাশিয়ার জন্য এ হচ্ছে "WIN-WIN Situation"।

(অবশ্য এই নিবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমে দানব সদৃশ পুতিন কোথায় থাবা বসাচ্ছে, কোথায় চিমটি কাটছে, কোথায় বা শুধু ভেংচি দিচ্ছে ইত্যাদি সংবাদ-বিসংবাদে সংবাদ মাধ্যম পরিপূর্ণ। যা থেকে ঘটনাপ্রবাহের দিশা পাওয়া যাচ্ছে না।)

এখন ঘটনা, অর্থাৎ জার্মানী এবং রাশিয়া কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘর সংসার করবে যা বাকী ইউরোপের কাছে এক দুর্ভাগ্যজনক এবং অনভিপ্রেত ঘটনা। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সদস্য কয়েকটি রাষ্ট্র নিকটবর্তী সমুদ্রাঞ্চলে রাশিয়ানদের উপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। ১২২২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গ্যাস পাইপলাইন বাল্টিক সাগরের নীচ দিয়ে ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং পোল্যান্ডের নিকটবর্তী সমুদ্রাঞ্চলের মধ্য দিয়ে জার্মানীতে গিয়ে পৌঁছাবে। অতএব এতদঞ্চলের যথাযথ পাহারাদারি ব্যবস্থাও করতে হবে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে (সঙ্গে মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

স্বভাবতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির কর্ণধারেরা ইউক্রেন এবং গ্যাস লাইন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহে স্বস্তিতে নেই। জার্মানী রাশিয়ার উপর গ্যাসের সরবরাহের জন্য আরও বেশি নির্ভর করার বাস্তবতা তাদের কাছে অবশ্যই সুখদায়ক ঘটনা হতে পারে না। গ্যাসের বাণিজ্যে জার্মানী এবং রাশিয়ার মধ্যে এক অবস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে এবং পারস্পরিক অবস্থার সম্পর্ক থেকে বাণিজ্যের গভীরতর সম্পর্ক তৈরি হবে, বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। বাণিজ্যের উপর প্রচলিত বাধা নিষেধগুলি প্রত্যাখ্যাত হলে, দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করলে যাতায়াত বাড়বে, ভ্রমণ শিল্পেও জোয়ার আসবে। নিরাপত্তার এক নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবে। সে এমন এক দুনিয়া যেখানে জার্মানী এবং রাশিয়া পরস্পরের বন্ধু, যখন মার্কিন সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজন আর থাকবে না। মহার্ঘ মার্কিন অস্ত্র সম্ভার বা ক্ষেপণাস্ত্রের প্রয়োজন থাকবে না। বাণিজ্য চুক্তির সম্পাদনের জন্য মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে না। জার্মানী এবং রাশিয়ার মধ্যে স্বদেশের মুদ্রার মাধ্যমেই বাণিজ্য করার সুযোগ হবে এবং ডলারের মূল্যের বিরাট পতন ঘটবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে, তাই একমেরু বিশ্বের একমেবদ্বিতীয়ম নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ওবামা প্রশাসন এবং তাঁর উত্তরসূরি বাইডেন প্রশাসন NORD 2-এর বিরোধিতা করবে এবং ইউক্রেনের ঘোলা জলে মাছ ধরতে উদ্যোগী হবেই। জার্মানী এবং রাশিয়ার সম্পর্ক বাণিজ্য দিয়ে শুরু হলেও এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে 'SUPER POWER' -এর একাধিপত্যের যুগের অবসান সূচিত করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে অন্তর্ঘাত বা অন্য কোনও উপায়ে NORD STREAM -এর সর্বনাশ সাধনে প্রচেষ্টার ত্রুটি করবে না। যেন তেন প্রকারেন জার্মানীর মতো রাষ্ট্রশক্তিকে নিজের কক্ষে রাখতে না পারলে আমেরিকা আর আমেরিকা থাকবে না। এতো তার অস্তিত্বের সঙ্কটের প্রশ্ন।

ঠিক এই জায়গাটাতেই ইউক্রেনের প্রাসঙ্গিকতা। ইউক্রেনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ওয়াশিংটন NORD STREAM প্রকল্পের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে উদ্যোগী, যেন তেন প্রকারেন রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে বিভেদ আনাটা তার বড় প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে এই গ্যাস পাইপের লাইন সমগ্র ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে জন্য সাহায্য

এরপর ৮ পাতায়

# আমরা রক্তবীজের ঝাড়

সৌম্য শাহীন

আনিস বামপন্থী গণ আন্দোলনের সন্তান ছিল। পার্ক সার্কাসের এন আর সি বিরোধী আন্দোলন হোক বা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন, প্রতিবাদী মুখ হিসেবে সুপরিচিত সদা হাস্যময় ছেলেটিকে রাজ্য সরকারের পুলিশ (নাকি পুলিশ সাজা তৃণমূলী গুণ্ডারা?) খুন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তার বাড়ির লোকজন সেই রাজ্য পুলিশের সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দলের প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না। প্রসঙ্গত সিটের নেতৃত্বে রয়েছেন জ্ঞানবন্ত সিংহ, যিনি রিজওয়ানুর রহমানের হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন। রিজওয়ানের খুনীরা আজও বহাল তবিয়তে আছে, শোনা যায়, তার শ্বশুর টোডিবাবু নাকি এখন শাসকদলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। দাদা রুকবানুরও ভাইয়ের মৃত্যুকে বিক্রি করে রাজনৈতিক কেরিয়ার গুছিয়েছে। সেই খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল যে জাভেদ খানের নামে, গত এগারো বাছর ধরে তিনি তৃণমূল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। এবারের ঘটনাতেও মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের ক্ষোভ প্রশমনের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর সরকারের ''মুসলিম মুখ'' ফিরহাদ হাকিমকে, যিনি ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতী তত্ত্ব হাজির করে তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। ইতিমধ্যে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ জেলার এসপি সৌম্য রায়, যিনি তৃণমূল বিধায়ক লাভলী মৈত্রর স্বামীও বটে, তিনি আনিসের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে রুজু হওয়া পকসো মামলার প্রসঙ্গ তুলে ভিক্টিম ব্লেমিংয়ের পরিচিত রাস্তায় হেঁটেছেন। অথচ আমরা সকলেই জানি যে পকসোর মতো নন বেলেবল ধারায় কেস হলে পুলিশ যথাশীঘ্র সম্ভব চার্জশিট দাখিল করতে বাধ্য। অথচ অভিযোগ দায়ের হওয়ার পাঁচ বছর পরেও কেসের কোনো অগ্রগতি না হওয়ার একটাই অর্থ—বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার মূল্য চোকাতে হয়েছে আনিসকে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েতের সময় থেকেই মিথ্যে মামলা দিয়ে বিরোধীদের চুপ করানোকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ, যিনি বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন রিজওয়ানুর হত্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম আবেগকে কাজে লাগিয়েছিলেন নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে একঝাঁক প্রথম সারির নেতার বিজেপিতে যোগদান, মোদী-শাহের প্রচার উপলক্ষে রাজ্যে ডেলি প্যাসেঞ্জারি, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশ্লীলভাবে কাঁচা টাকা ওড়া, সংবাদমাধ্যমের ঢক্কানিনাদ—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এই বুঝি বাংলায় বিজেপি চলে এলো। তৈরি হলো এক বিপজ্জনক বাইনারির—দুই দক্ষিণপন্থী শক্তির মধ্যে কম ক্ষতিকারককে বেছে নেওয়াই যেন বাংলার মানুষের একমাত্র ভবিতব্য—এমনটাই বোঝালেন দিল্লীর তান্ত্বিক অতিবাম নেতা ও তাঁর এই রাজ্যের চেলা চামুন্ডারা। গত ৭৫ বছরে বাম প্রতিনিধি ছাড়া এই প্রথমবার বিধানসভা গঠিত হয়েছে বাংলায়। শুধু তাই নয়, প্রায় নব্বই শতাংশ ভোট ভাগ হয়ে গেছে দক্ষিণপন্থী এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর মধ্যে। একথা সত্যি যে, ফ্যাসিস্ট বিজেপি রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে না পারায় প্রগতিশীল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু এর ফলে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজনীতি যে কার্যত বৈধতা পেয়ে গেলো এবারের বিধানসভা নির্বাচনে, একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। নির্বাচন পরবর্তী হিংসার যে চিত্র বাংলার মানুষ দেখছে, বিশেষত সদ্য শেষ হওয়া পুর নির্বাচনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নিয়ে শাসকদল যেভাবে ছিনিমিনি খেলছে, তাতে একটা কথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রীয় হিংসার রাজনীতিই আগামী পাঁচ বছরে বাংলার মানুষের ললাটলিখন।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের খারাপ ফলের পর থেকেই রাজ্যে আর এস এস পরিচালিত সংস্থাগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়তে শুরু করে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আর এস এস-এর শাখাপ্রশাখা বাড়তেই থাকে। একইভাবে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে অসরকারি খারিজি মাদ্রাসার সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পায়, এবং সেগুলি মূলত ব্যবহৃত হয় ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা ছড়ানোর কাজে। ফলে রাজ্য সাম্প্রদায়িক বারুদের স্তূপের ওপরেই বসেছিল। যার ফল আমরা দেখি ধূলাগড়, বসিরহাট, কালিয়াচক, দত্তপুকুরে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় প্রশাসনের নাকের ডগায় দাঙ্গা বাধানো হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে। সাধারণ খেটে খাওয়া হিন্দু ও মুসলমান মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় গোটা রাজ্যে। কর্পোরেট মিডিয়া এবং বিজেপির আইটি সেল ধর্মীয় বিদ্বেষ পৌঁছে দেয় বাংলার ঘরে ঘরে। অর্থনৈতিক দুর্দশা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চাপা পড়ে যায় মেরুকরণের বাতাবরণে, ফলে রুটিরুজি ও অধিকারের প্রশ্নে বামপন্থীদের তোলা জরুরি প্রশ্নগুলো ভোটের বাজারে মানুষের কাছে পর্যাপ্তভাবে পৌঁছয় না। অন্যদিকে সঙ্কটগ্রস্ত, বিপন্ন জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলির সুরাহা করতে না পারলেও রাজ্য সরকার বিনামূল্যে রেশন, দুয়ারে সরকার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রান্তিক, গরিব এবং শ্রমজীবী মানুষকে তাৎক্ষণিক সুরাহা পৌঁছে দিয়েছে। এর ফলে শাসকদলের হৃত জনসমর্থন শুধু ফেরতই আসেনি, অনেকটাই বেড়েছে।

তারপরেও, উপনির্বাচন এবং কলকাতা বিধাননগর, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনে পেশী শক্তির অবাধ ব্যবহারে একটা কথা পরিষ্কার যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রাজ্যে কোনোরকম বিরোধী কণ্ঠস্বরকে জায়গা দিতে রাজি নন। বিশেষত, শাসক বিরোধী মুসলিমদের টার্গেট করছে রাজ্য সরকারের পুলিশ, কারণ কোনো মতেই বাঙালি মুসলিমের ভোট ভাগ হতে দিতে তারা রাজি নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো করে বোঝেন তাঁর সরকারের জিয়নকাঠি কাদের হাতে আছে। তাই একটা গোটা সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্কে ''দুধেল গাই'' বিশেষণ দিতে আটকায় না তাঁর। সমস্যা হলো, বাংলার মুসলিমরা এই সত্যিটা বুঝতে শুরু করেছেন, আর কোণঠাসা হতে হতে তারা প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে ভুগছেন। রাষ্ট্রের সামনে রোজ রোজ দেশপ্রেমের প্রমাণ দেওয়ার থেকে তারা আজ নিজেদের আত্মপরিচয়কে সজোরে ঘোষণা করতে চাইছে। তারই প্রমাণ আমরা পেয়েছি সাম্প্রতিক হিজাব বিতর্ককে কেন্দ্র করে। আর সাধারণ মুসলমানের এই অসহয়তার সুযোগ নিয়েই রমরমা হচ্ছে ক্রুড আইডেন্টিটি পলিটিক্সের। পরিচিতি সত্তা পিচ্ছিল রাজনীতির বিপরীতে শ্রেণিরাজনীতিকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল যে প্রতিবাদী মুখগুলো, আনিস খান তাঁদেরই একজন। আর সেইজন্যই খুন হতে হলো তাকে, কারণ মুসলমান নয়, একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবেই নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিল সে। আজ শত চাপের মুখেও তার সন্তানহারা পিতার মুখে এই কথাই উঠে এলো। এরকম বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরই তো আমাদের ভরসা জোগায়, বুঝিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর সব শিরদাঁড়াকে আজও কিনতে পারে না শাসক। বাজারী কবি বা গায়ক, অধ্যাপক বা নাট্যকাররা রাজানুগ্রহের লোভে যখন হিরন্ময় নীরবতা পালন করেন, তখন আনিসের সাথী হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী প্রতিবাদে রাস্তায় নামে, পুলিশের লাঠি খায়, গ্রেফতার হয়। এরাই আমাদের আগামী, আমাদের ভবিষ্যৎ। এদের এই হার না মানা সাহস রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিক যে, কমিউনিস্টরা রক্তবীজের ঝাড়— একজনকে খুন করলে আরো হাজারজনের বুকে তার স্বপ্নগুলো সঞ্চারিত হয়।

সুদীপ্তর রক্তে জন্মে হয় মইদুলের, মইদুল রাজপথ কাঁপায় আনিস নামে। আনিসের মৃত্যু আরো অজস্র সোনার টুকরো ছেলেমেয়েদের জন্ম দিক। যারা নিশ্চিন্ত কেরিয়ারের রাস্তা ছেড়ে চ্যালেঞ্জ নেবে ক্ষমতার চোখে চোখ রাখার।

# আনিস হত্যার মূল চক্রী তৃণমূলী দুর্বৃত্ত ও পুলিশ

প্রতিবাদী ছাত্রনেতা আনিস খানকে নৃশংসভাবে খুন করেছে তৃণমূলী দুর্বৃত্তরা। যথারীতি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে সহায়ক রাজ্যের পুলিশবাহিনী। বিগত প্রায় এগারো বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই পুলিশবাহিনী ও সাধারণ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নিবিড় যোগাসাজসে সাধারণ মানুষের জীবন নিরাপত্তা হীনতায় বিপর্যস্ত। ২০১১ সালে রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে এক রামধনু জোট। নির্বাচনী প্রচারেই তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন বা দাবি করেছিলেন যে তিনি রাজ্যের সমস্ত গুণ্ডাদের 'কন্ট্রোল' করেন বা নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পর থেকেই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বামপন্থী নেতাকর্মীদের ওপর লাগামহীন আক্রমণ নেমে আসে। একের পর এক খুন, সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজ্যের সাধারণ জীবনে ঘোর নৈরাজ্যের পরিবেশ। অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে তৃণমূলী দুর্বৃত্তরা। এদের প্রোটেকশন বা রক্ষা করেছে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বাহিনীরও কয়েকজন যেমন, গার্ডেনরিচ কলেজ নির্বাচন কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর হিংস্র হানাহানিতে মারা পড়েন তাপস চৌধুরী। বিভিন্ন থানায় পুলিশ কর্মীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আত্মরক্ষায় নানা আড়াল খোঁজেন। সবচাইতে সহজ আড়াল তৃণমূলী গুন্ডাদের কাছে আত্মসমর্পণ। তাই করেন অনেকে, বাঁচার তাগিদে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রতিনিয়ত বেড়েই চলে।

তৃণমূলী দুঃশাসনের প্রথম অবস্থায় পুলিশের কর্তব্য পুলিশই পালন করতো। হোমগার্ড কিছু সংখ্যক ছিল। কিন্তু সিভিক ভলান্টিয়ার নাম করে ঠিকা ভিত্তিতে তৃণমূল আশ্রিত দুর্বৃত্তদের পুলিশ বাহিনীর কাজে নিযুক্ত করা শুরু হল নতুন সরকারের প্রায় সূচনা লগ্নে। নিয়মিত চাকুরি নয়। ডিউটি পড়লে কিছু টাকা দিনমজুরি হিসেবে পাবে। কাজ না থাকলে তাদের উপার্জনও বন্ধ। একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ পাওয়া অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেস দলের ঘনিষ্ঠ। অনেকেই আবার নানা ধরনের সমাজবিরোধী অপকর্মে হাত পাকিয়েই গ্রামে বা শহরে তৃণমূল নেতাদের কাছাকাছি এসেছেন। এমনভাবে অনিয়মিত হলেও অর্থোপার্জনের সুযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষের বিনিময়ে প্রাপ্ত। চাকুরি দেবার কোনোও স্বচ্ছ নিয়মকানুনই এ রাজ্যে আর মানা হয় না। সরকারের বা শাসক দলের পছন্দমত মানুষকে উৎকোচ বা ঘুষের বিনিময়ে অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত করা চলছে বিনা বাধায়।

এইসব সিভিক পুলিশের পক্ষে কোনও ন্যায়সঙ্গত অবস্থান গ্রহণ করা বস্তুত অসম্ভব। পুলিশের বড় কর্তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে না মানলে পরের দিন আর কাজ থাকবে না। অতএব বহু যুবক স্বেচ্ছায় না হলেও শাসকদলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর সদস্য হয়ে পড়ছে। আমতা থানার দক্ষিণ সারদা গ্রামে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হলো তার সঙ্গে তিনজন সিভিক পুলিশের যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করে মমতা ব্যানার্জী সরকার মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার অপপ্রয়াস নিয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া একজন হোমগার্ডের স্ত্রীও এই অঘটনের সঙ্গে তাঁর স্বামীর যুক্ত থাকার কথা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন। তিনিও নিহত আনিস খানের হতভাগ্য পিতার মতোই সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন। আসলে মনে হচ্ছে, বড় কোনও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবার ভয়ে শিহরিত মমতা ব্যানার্জী সরকার। ছোটখাটো দু'চারজনকে ফাঁসিয়ে দিয়ে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবার অপচেষ্টা করে চলেছে। সত্য নিশ্চিতই অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। হঠাৎ আমতা থানার ওসিকে ছুটিতে পাঠানো হলো। প্রাথমিকভাবে এই ওসি তো এমন খুনের সঙ্গে সংশ্রব জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল। এখন জানা যাচ্ছে, পুলিশ সবই জানত এবং উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তাদের নির্দেশেই আনিস খানকে হত্যা করা হয়েছে। আরও জানতে পারা যাচ্ছে যে, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখেই খুনীরা রাত একটার পরে আনিসের বাড়িতে হানা দেয়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিধায়কের যোগসাজস উপেক্ষা করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ মানুষদের স্মরণে আছে বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রথম থেকে দীর্ঘ ১৯৭৭ পর্যন্ত, ভয়ঙ্কর আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের দিনগুলির কথা। সেইসময় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নারকীয় আবহ নির্মিত হয়েছিল। অগণিত বামপন্থী কর্মী নেতাকে অকাতরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শক্তির নিকৃষ্টতম অংশকে সংগঠিত করেই তৃণমূল কংগ্রেস দলটি গঠিত হয়। গুন্ডা নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি সেকারণেই তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন। বরানগর-কাশিপুর হত্যাকান্ড সংগঠিত করেছিল এই গুন্ডারাই। তাদের মদত দিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। এসব তো ইতিহাসের অংশ। অনেকেই ভাল জানেন। বেশ কয়েক বছর আগে থেকে চলতে থাকা এই তাণ্ডবের সময়কাল উল্লিখিত হয় ৭২ থেকে ৭৭। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সেই সময়কালে সন্ত্রাস মুখ্যত কলকাতা শহর শহরতলী ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ বাংলা, যেখানে অধিকাংশ মানুষের বসবাস, সেগুলি তুলনায় কম উপদ্রুত ছিল।

আশির দশকের আগে পর্যন্ত গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত

এরপর ৭ পাতায়

# আনিস হত্যা মমতা ব্যানার্জি ও তার গেস্টাপো বাহিনীকেই চিনিয়ে দিচ্ছে

তৃণমূল আমলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এই রাজ্যে আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তা একটু একটু করে কখন যেন এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়েছে, যার শিকড় ছড়িয়ে গেছে গভীরে। আনিস-হত্যা সেই ভয়ংকর শক্তি একঝলকে দেখিয়ে দিল আমাদের। জরুরি অবস্থার পরে, এমন গভীর থেকে গভীরে ছড়িয়ে যাওয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও স্বৈরাচার রাজ্যরাজনীতিতে দেখা যায়নি বললেই চলে। অল্প সময়ের জন্য সিঙ্গুরে বা নন্দীগ্রামে যা ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে দেখা যেত, এবং যা নিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারে সেদিন মুখর হয়ে উঠত গণমাধ্যম; — তা এখন যেন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কখনো তা কর্পোরেট প্রণোদিত, যেমনটা দেখা যাচ্ছে দেউচা-পাচামিকে কেন্দ্র করে এক বিস্তীর্ণ এলাকায়। আবার কখনো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে আসছে প্রতিবাদী ব্যক্তি বিশেষের ওপর—যার সর্বশেষ উদাহরণ আনিস-হত্যা। সবটাই ঘটে চলেছে মহানেত্রীর অনুপ্রেরণায়— যিনি এ রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী। নির্মমতা ও মিথ্যাচারে তিনি যেন হিটলার ও গোয়েবেলসের নবতম হাইব্রিড।

এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পাবার পরেই মানুষ দেখেছিল কিভাবে সুকৌশলে রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করে ২০১১ সালের বিধানসভার নির্বাচনের আগে যিনি মমতা ব্যানার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চান বলে ঘোষণা করেন, সেই মাওবাদী সহযোগী কিষানজির মাথার খুলি গুলি করে উড়িয়ে দেওয়া হলো। শ্রেণিহিংসায় বিশ্বাসী মাওবাদী নেতাকে নিকেশ করে নেত্রী সেই সুযোগে ভারত-রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রয়োজনে এনকাউন্টার প্রয়োগের ''বৈধতা''ই আদায় করে নেন। তারপর, অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি কেড়ে, ভাঙরে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পাওয়ার-গ্রিড বসানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর প্রথমে স্থানীয় গুন্ডা ও পরে পুলিশ পাঠিয়ে দুইজনকে হত্যা করা হয়। পরে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আপসরফা করে—পুলিসের কারা ঠাণ্ডা মাথায় গুলিচালিয়ে নরহত্যা করেছিল তা লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু, এই রাজ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আসল রূপ দেখা যায় যে কোনো নির্বাচনের আগে-মধ্যে এবং ফলাফল প্রকাশের পরে। নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারক হয়ে উঠছে রাজ্যের পুলিশ/সিভিক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আনুপাতিক উপস্থিতি ও কার্যকারিতা। ভারতের আর কোনো রাজ্যেই যা ঘটে না। এই রাজ্যের আই পি এস ও আই এ এসদের কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে। এ রাজ্যের প্রায় যাবতীয় সেলিব্রিটি এখন তাঁর কেনা গোলাম, প্রচার-প্রমুখ।

নির্বাচনের আগে, ভোটগ্রহণ পর্বে, এমনকি নির্বাচনের পরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা এ রাজ্যে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় গুন্ডাদের ব্যবহার করে এই কাজ করা হয়। ক্রমশ, এই রাজ্যের যাবতীয় ক্লাব ও অসরকারী সংস্থাদের অনুদান জুগিয়ে রাজনৈতিক দমনপীড়নের অংশীদার করে তোলা হচ্ছে। এরই মধ্যে, সিভিক পুলিশ নামে এক বিপুল বাহিনী তৈরি করে যে বেআইনি কাজ পুলিশের করার ক্ষেত্রে কিছুটা ঝুঁকি আছে, সে সব করবার রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। পুলিশের কাজের জন্য কিছু নিয়মনীতি ও বিধিনিষেধ, যৎসামান্য হলেও আছে। সিভিক পুলিশের ওপর সেই নিয়ম বর্তায় না। তাই এই সুযোগে, হিটলারের জর্মন পুলিশ গেস্টাপোর মতোই এদের কাজে লাগানো হচ্ছে। আনিস হত্যা যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও না বললেই নয়। বিজেপি'র হিন্দুত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে আপসহীন দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

তুষার চক্রবর্তী

লড়াই লড়বার বদলে এ রাজ্যের একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, এই রাজ্যে চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পাইকারী হারে ভোটরিগিং এর প্রথম সার্থক কারিগর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েরই সৃষ্ট স্বঘোষিত ''গুন্ডা কন্ট্রোল'' কারী নেত্রীকে ''জনবাদী'' আখ্যা দিয়ে লাগাতার সমর্থন জুগিয়ে আসছেন। এরা ভুলে যান, পরবর্তীকালে কংগ্রেসে খুব বেশি সুবিধে না পেয়ে আণ্ডনখোর আজন্ম-সন্ত্রাসী এই নেত্রী যখন ক্ষুব্ধ—তখন সংঘ-পরিবার ও বিজেপি তাঁদের কমিউনিস্ট নিধনের পবিত্রব্রতে কাজে লাগাবার জন্যে তাকেই নির্ভুলভাবে বেছে নিয়েছিল। রেলমন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ দিয়ে অলংকৃত করেছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী, রাজনাথ সিং, যশোবন্ত সিং প্রমুখের নয়নমণি হয়ে উঠতে যার দেরী হয়নি। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুঠ করে এই নেত্রী তখনই গুন্ডাশ্রয়ী, ''নামে-কংগ্রেস কাজে-বিজেপি'' তৃণমূল-কংগ্রেস দলকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় গড়ে তোলেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই দলটির মূল নীতি—যখন যেমন তখন তেমন আপসরফার মাধ্যমে, পুঁজিবাদী মুনাফা বৃদ্ধির কায়দায় দলটিকে চালানো। লাগাতার দলীয় অর্থভাণ্ডার ও মহানেত্রীর ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিবর্ধন চালিয়ে যাওয়া।

এ কথা ঠিক যে, বিরোধী নেত্রী থাকার সময় থেকেই মমতা ব্যানার্জি যাবতীয় স্বতঃস্ফূর্ত ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। কিন্তু, তা জনদরদ থেকে কখনই নয়। আন্দোলনের সুযোগে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা ও আন্দোলনকে দখল করার উদ্দেশ্যেই এই কাজ করা হয়। এই ''জনবাদী'' নেত্রীর ''জনপ্রিয়তা'' অর্জনের আরেকটি মূল উপায় সদা-সর্বদা সব ব্যাপারে নিজেই নিজেকে সেরা বলে ঘোষণা করা। সর্বত্র নিজের মুখচ্ছবি বিজ্ঞাপিত করা। যা অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু, ভুললে চলবে না, এ সবকিছুই নেত্রীর নিজেকে বিপণন করার কৌশল। দেশে এই ব্যাপারে সম্ভবত একমাত্র তিনিই নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য উত্তরসূরি হতে পারেন। সুযোগ পেলেই—বিজেপির সহায়তায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনের দিকে ঝাঁপ দিতে এখন প্রস্তুত। সেই সুযোগ তিনি এখন দিবারাত্র খুঁজছেন। যারা তৃণমূলকে বিজেপির ফ্যাসিবাদ রক্ষার ''জনবাদী'' বিকল্প হিসেবে দেখছে, তারা জেনে হোক বা না জেনে, ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচারী সর্বাঙ্গীন আধিপত্যবাদের দুনিয়াব্যাপী মহাপ্রকল্পের অংশীদার হয়ে উঠছেন।

অবশ্যই ভারতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একটি বৃহৎ জনবহুল রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করে দেবার সাফল্য, মমতা ব্যানার্জির মতো, আর কেউ দেখাতে পারেননি। রাজ্য দখলের পর, এখন নেত্রী ভারত দখলের জন্য জান-প্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছেন। দেশের ভার হাতে পেলে—সারা দেশটাকেই তিনি বিরোধীশূন্য করে ফেলবেন। সেই মহা প্রকল্পের রিহার্সালই এখন চলছে পশ্চিমবাংলায়। তাই ভুললে চলবে না, তথাকথিত ''জনবাদী'' নেত্রী গত দশ বছরে রাজ্য জুড়ে মেলা, খেলা, আর সেলিব্রিটিদের চেলা বানাবার প্রকাশ্য কর্মসূচির আড়ালে গড়ে তুলেছেন তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এক গেস্টাপো বাহিনী। সিভিক পুলিশ নামধারী এই বাহিনী নেত্রীর যাবতীয় ইচ্ছাকে নিমেষে কাজে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা রাখে। আমতায়, নিজের গ্রামে, নিজের বাড়িতে আনিসকে তিনতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এই গেস্টাপো বাহিনী। মাঝরাতে পুলিশভ্যানে দলবদ্ধভাবে তারা হানা দিয়েছিল সালিমের বাড়িতে। দেশের ও রাজ্যের আইনে পুলিশও যা করতে পারে না। একজন রাইফেল ঠেকান আনিসের বাবার বুকে, যিনি আনিস বাড়িতে নেই বলে, পরিবারকে এই মধ্যরাতের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনজন পুলিশের পোশাক পরা গুন্ডা, বাড়িতে ঢুকে, আনিসকে নৃশংসভাবে খুন করে তিনতলা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়, আনিসের প্রতিবাদী মুখ বন্ধ করার জন্য। মাঝরাত থেকে থানায় বারবার ফোন করা হলেও, পরদিন বেলা ৯টার আগে পুলিশ আসেনি। পুলিশ আসবার পরেও, তারা আগের রাতে কারা হানা দিয়েছিল তা চেপে যায়। চেষ্টা চালায়—অজ্ঞাতপরিচয় পুলিশের পোশাক পরা দুষ্কৃতীদের ঘাড়ে অপরাধ চালান করার। এটাও বলে, যে হয়ত তাদের দেখে ভয় পেয়ে আনিস নিজেই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। অতিদ্রুত তার মৃতদেহের নাম-কা-ওয়াস্তা পোস্টমর্টেম করে, আনিসকে কবর দেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু, আনিসের বাবা, ভাই সহ পরিজন ও সারা গ্রাম রুখে দাঁড়াবার ফলে, আনিস-হত্যা, এ রাজ্যে, প্রায় প্রতিদিন ঘটে চলা এমন অজস্র ঘটনার মতো চাপা দেওয়া যায় নি। ছাত্রযুবকদের একের পর এক মহামিছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেহারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। প্রকাশিত হচ্ছে সত্য।

না, আনিস-হত্যা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ছোট্ট ঘটনাও নয়। ন—আচমকা বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাও নয়। কাশীনাথ বেরা বা প্রীতম ভট্টাচার্যের মতো হোমগার্ড ও সিভিক পুলিশ যে নিজে থেকে এই কাজ করতে পারে না—করেছে ওপর মহলের নির্দেশে, তা এই দুই অপরাধী যেমন বলছে, তেমনি, অন্যরাও। এই ওপরমহলের কতো ওপরের তা যে তদন্তে প্রকাশ পাবে সেই আশা যদিও দুরাশা। অম্বিকেশ মহাপাত্র থেকে শুরু করে আনিস খানের ওপর গেস্টাপো হানা ঘটেছে মধ্যরাতে। রাজ্যজুড়ে, অঞ্চলে অঞ্চলে এই মধ্যরাতের গেস্টাপো আক্রমণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে, এরপর দিনে দুপুরেও এই ধরনের আক্রমণ যে কোনো মানুষের ওপর নেমে আসবে, সেটা নিশ্চিত।

# আনিস হত্যার মূল চক্রী তৃণমূলী দুর্বৃত্ত ও পুলিশ

৬-এর পাতার পর

নিম্নমানের। অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতিরও কোনও বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামীণ মানুষের স্বশাসন বলে কিছুই ছিল না। পঞ্চায়েতী নির্বাচন প্রায় বাইশ বছর যাবৎ বন্ধ ছিল। অতএব এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে উন্নয়নের প্রসঙ্গও ছিলনা। কায়েমী স্বার্থের অবস্থিতি অবশ্যই ছিল। কিন্তু, কম সংখ্যক গ্রামীণ সমাজ বিগত কিছুকালের মতো এমন মূল্যবোধহীন বেপরোয়া আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সেই সময়ের শত অভাবের মধ্যেও 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ের' সন্ধান পাওয়া যেত গ্রাম বাংলায়। গ্রামীণ মানুষদের যুক্ত করে তাঁদের উন্নয়ন ভাবনা বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম দিকেই শুরু হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৭৭ সালেই বলেছিলেন যে, বাংলার প্রশাসন শুধুমাত্র রাইটার্স বিল্ডিং নির্ভর থাকবে না। গ্রামপঞ্চায়েতের বন্ধ হয়ে পড়া নির্বাচন সংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে ক্ষমতাকেন্দ্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাভাব থাকলেও গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। কালে কালে ভারত সরকারও এ প্রসঙ্গে বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। বাজার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন গ্রামীণ মানুষদের ন্যূনতম উন্নয়ন না করে সম্ভব হবে না তা দিল্লির কর্তারাও বুঝেছিলেন। ফলে লক্ষ করা যায় যে নব্বই দশকের প্রায় মধ্যবর্তী সময় থেকেই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় অর্থ সমাগম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সহস্রাব্দের শুরু থেকে এই আর্থিক বরাদ্দ তাৎপর্যপূর্ণভাবেই বেড়ে যায়। সরাসরি পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকা সমধিক গুরুত্ব পেতে থাকে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসনকালে গ্রামে গ্রামে দ্রুতবেগে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা পঞ্চায়েতী ক্ষমতা দখলে উদগ্র ভূমিকা নেয়। পঞ্চায়েত মানেই প্রচুর অর্থ। প্রচুর অর্থ মানেই ব্যাপক দুর্নীতির সুযোগ অবারিত হওয়া। ২০১৭ সালে তৃণমূল নেত্রী কেন একশ শতাংশ পঞ্চায়েতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ক্ষেপে উঠেছিলেন তা সহজবোধ্য। গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতি নীতি বিসর্জন দিয়ে অধিকাংশ পঞ্চায়েত দখল করে দলীয় দুর্বৃত্তদের লুণ্ঠন করার অবাধ সুযোগ করে দিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বও পঁচাত্তর শতাংশ ও পঁচিশ শতাংশ'র হিসেব করার কারণ বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। অবৈধভাবে এধরনের লুঠপাটের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্যই গ্রামীণ বাংলায় সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটানো নয়। পরিকল্পনা করেই সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বেশির ভাগ পঞ্চায়েতে নিজের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বিচারে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ব্যবহার করছে প্রায় ২০১১ সাল থেকেই।

পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে কায়েমী স্বার্থ বলীয়ান হয়ে ওঠে। লুম্পেনদের অঢেল ক্ষমতা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে ক্ষমতা কেন্দ্র নির্মাণ করে ফেলে দ্রুত। এইসব মনুষ্যেতর জীবদের কোনও নীতি বা আদর্শের বালাই নেই। দেশ কাল সম্পর্কে কোনও ভাবনা নেই। শুধুমাত্র অর্থবল ও বাহুবল প্রয়োগ করে স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমস্ত ধরনের নির্বাচনে এই ধরনের বাহিনীগুলি মমতা ব্যানার্জীর প্রধান সহায়। তিনি এদের ওপর নির্ভর করেই রাজ্যপাট চালাতে উদগ্রীব। নবান্নের চোদ্দতলায় বসে সর্ব বিষয়ে বিশারদের মতো মন্তব্য করে চলেন তৃণমূল নেত্রী। এসবের অবৈধ সুযোগে গ্রামীণ বাংলায় এক চরম নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটে চলেছে ।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী কোন প্রতিবাদ বা সুস্থ মানসিকতার অস্তিত্ব পর্যন্ত ওইসব অপশক্তি বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। রাজ্য প্রশাসনের অকুণ্ঠ মদতে এই চরম সমাজবিরোধী মানসিকতা গভীরভাবে গ্রামসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আনিস খান হত্যার বীভৎসা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে এইসব প্রসঙ্গগুলি স্মরণে রেখেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ বলে মনে হয়।

Vol. 68 Issue No. 45 শনিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com



# ইউক্রেন সঙ্কটে জার্মানীর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য

৫-এর পাতার পর

করবে এবং ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়াকে বাগে আনতে বেগ দেবে। শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রকল্পের বিরোধিতা করলেও জার্মানীর চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল গ্যাস প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে নি। আলেরিখ নজেলনি নিয়ে জার্মানি ও রাশিয়ার তীব্র সংঘাত হলেও ১১ বিলিয়ান ডলারের প্রকল্পের কাজ থেমে থাকেনি। সেপ্টেম্বর ২০২১-এ NORD STREAM-2 প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রসঙ্গত ইউক্রেনে বর্তমান সঙ্কটের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার মধ্যে দুটি নিষেধাজ্ঞা বাইডেন প্রশাসন কূটনীতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তুলে নেয়।

গ্যাস লাইন প্রকল্পটি কার্যকর করার বিরুদ্ধে মরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং জার্মান চ্যান্সেলর মার্কেলের মধ্যে এক বৈঠক হয়, এই বৈঠকে মোটামুটি স্থির হয়, এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে রাশিয়া যেন কোনোভাবেই গ্যাস লাইন প্রকল্পকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে, তবে ইউরোপের অন্যান্য গ্যাস লাইন প্রকল্পের দেশগুলি ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডের জার্মানীর সমর্থনে এসে দাঁড়ানোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত পিছু হটে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি প্রত্যাহার করে নেয়। বস্তুত এই ঘটনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক প্রকার পিছু হঠা বা আত্মসমর্পণ বলা যেতে পারে।

কৌতুকের বিষয়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাইডেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা লাগাতার বলে চলেছে যদি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে রাশিয়ার সাধের NORD STREAM প্রকল্পের বারোটা বাজানো হবে, অর্থাৎ, প্রথম আঘাতটা NORD STREAM এর উপরই পড়বে। বাইডেন এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলাৎজ এর এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বাইডেন বলেন, যদি রাশিয়া আক্রমণ করে অর্থাৎ রাশিয়ান সেনা ইউক্রেনের সীমানা অতিক্রম করলে NORD STREAM এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। জার্মান চ্যান্সেলরের উপস্থিতিতেই বাইডেন এমন ঔদ্ধত্যর পরিচয় দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে জার্মানী এবং রাশিয়ার অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে ইউরোপের মাটিতে আমেরিকার আধিপত্যের অবসান সূচিত করবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমেরিকান আধিপত্যের যে যুগের সূচনা হয়েছিল এক ঝটকায় NORD STREAM 2 প্রকল্পের বাস্তবায়ন সব কিছু তছনছ করে দেবে।

**ওলাফ শোলৎজ কূটনীতি**—ঘরে এবং বাইরে শোলাৎজের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইছে যে কূটনৈতিক দিক থেকে ওলাফ শোলাৎজ ইউক্রেন সঙ্কটে যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এমনকি ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁকরোর পেছনে পড়ে গেছেন। মাঁকরো কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে পিং পং কূটনীতির উপর নির্ভর করে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন, এবং শোলৎজের বিশ্বাস জার্মানী কোনো অবস্থায় ন্যাটোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। শোলৎজের বিরুদ্ধে সমালোচনার জবাব দিতে আমেরিকা সফর সারলেন। সেখানে তিনি বলেন, যদি সত্যিই ইউক্রেনের উপর আক্রমণ ঘটে, তে তার সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে এবং যৌথ ভাবে আক্রমণের মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু এই সফরকালে জার্মান চ্যান্সেলর Nord Stream এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি।

কূটনৈতিক তৎপরতায় ওলফ্ শোলৎজ ফরাসী প্রেসিডেন্ট মাঁকরোর সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি কিয়েভে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলদেমির হেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কিয়েভ থেকে ফেরার পথে মস্কোও তাঁর সফরসূচি থেকে বাদ পড়েনি। পুতিনের সঙ্গেও বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পর রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয় জার্মানীর সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মতানৈক্য থাকলেও রাশিয়া আংশিকভাবে ইউক্রেন সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে। রাশিয়ার এই ঘোষণা অবশ্যই ইউরোপের নেতা হিসাবে ওলাফ শোৎজের ভাবমূর্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে।

ওবামা প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন এবং বাইডেন প্রশাসন কার্যত লাগাতার একটা ক্ষেত্রেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রটা হল তেল এবং বর্তমানে গ্যাস।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন চাহিদার ৫ শতাংশেরও কম গ্যাস আমেরিকা থেকে আমদানি করে, রাশিয়া চাহিদার ৪১ শতাংশ, নরওয়ে ১৬ শতাংশ, আলজিরিয়া ৭.৬ শতাংশ এবং কাতার ৫.২ শতাংশ গ্যাস ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলিতে রপ্তানি করে। গত দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা ইউরোপের বাজারে গ্যাস রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে বিশেষ আগ্রহী হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে আমেরিকার গ্যাসের রপ্তানির ২৩ শতাংশই ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে রপ্তানি হয়, ২০২১ সালে এই রপ্তানির পরিমাণটা ২১ বিলিয়ান কিউবিক মিটারে পৌঁছিয়েছে। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, গ্রীস, পর্তুগাল এবং অনেক ছোট দেশগুলিও এই গ্যাসের ক্রেতা। জানুয়ারিতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মাঝে ইউরোপ রাশিয়ার তুলনায় আমেরিকার থেকেই বেশি পরিমাণ গ্যাস আমদানি করেছে।

NORD STREAM এর বহন ক্ষমতা :

NORD STREAM 2 NORD STREAM এরই বর্ধিত সংস্করণ। NORD STREAM-এর মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি শুরু হয় ২০১১ সালে। প্রথম পাইপ লাইনের মতই NORD STREAM 2 যে দুইটি পাইপলাইন আছে, দুইটি লাইনের প্রতিটি গ্যাস বহনের ক্ষমতা বছরে ৫৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। রাশিয়া এই লাইনের মাধ্যমে এবং ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে ২০২০ সালে মোট ১৬৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করেছে। জার্মানী ছিল সবচেয়ে বড় খদ্দের ৫৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার, ইটালি কিনেছিল ২০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং নেদারল্যান্ড ১১ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। রাশিয়ান অর্থনীতি বর্তমানে মূলত তেল এবং গ্যাসের উপরই নির্ভরশীল এবং ইউরোপ হল বৃহত্তম খদ্দের। NORD STREAM 2 এর মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানির সবটাই সম্ভব। তাই জার্মানীর কাছেও যে কোনো ভাবেই হোক, যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করাটা বিশেষ জরুরি। পরিশেষে পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন গ্যাস রপ্তানি নির্ভর রাশিয়া জার্মানীর মৈত্রী Super Power বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের সুউচ্চ মিনার থেকে পতনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছে। যেন তেন প্রকারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন মূল রণনীতি হল 'NORD STREAM' প্রকল্পের সর্বনাশ করে জার্মানীকে তার প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে এবং এখানেই ইউক্রেনের প্রাসঙ্গিকতা। ওয়াশিংটনের কাছে ইউক্রেন হল এমন এক সঙ্কট যা অস্ত্র হিসাবে রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাশিয়া ইউরোপের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক দেশ — এমন এক ধারণা সৃষ্টি করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত প্রচার মাধ্যম ত্রাহি চিৎকার করে চলেছেন। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণে উদ্যত, যে কোনও মুহূর্তে এই আক্রমণ ঘটতে পারে।

প্রসঙ্গত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজ পর্যন্ত রাশিয়া কোনও দেশ আক্রমণ করেনি—তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময়কালে ৫০টি দেশে আক্রমণ চালিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৮০০টিরও বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। মজার বিষয়, প্রচার মাধ্যমে পুতিনকেই 'শয়তান' হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ মাধ্যমের প্রদত্ত শেষ খবর—১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রাশিয়া পরমাণু যুদ্ধের মহড়া শুরু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জোর গলায় বলছেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যেই রাশিয়া ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযান শুরু করবে। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সদ্য রাশিয়া থকে ফিরে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ দাবি করছেন প্রয়োজনে মস্কো বৈঠকে বসতে রাজি। ন্যাটো কর্তৃপক্ষ মস্কোর সাথে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অতঃকিম— জো বাইডেন এখন উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। ইউক্রেনে যুদ্ধটা লাগাতে পারলে আমেরিকার পোয়া বারো। ইউরোপের মাটিতে তার আধিপত্য অটুট থাকবে। আর না লাগলে NORD STREAM দিয়ে গ্যাসের প্রবাহ চলবে। শেষ পর্যন্ত কি হয় তার জন্য আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে ইউক্রেন সঙ্কটে জার্মানী এবং NORD STREAM প্রকল্প অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

*২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২*

# কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অতিমারির সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ

৩-এর পাতার পর

মোকাবিলায় সরকারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে গলা ফাটাচ্ছিলেন তখনই খাদ্যসুরক্ষা জনিত এই বঞ্চনা পশ্চিমবঙ্গে চরম মাত্রায় পৌঁছেছিল। সারা দেশে করা ৬৬৯৭ জনের মধ্যে ১৯৯২ জনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এই ধরনের দুর্দশার চিত্র সামনে নিয়ে এসেছে।

সারা দেশের পরিসরে এই সমীক্ষার আওতায় এসেছে ৩১ শতাংশ তপশিলি আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ২৫ শতাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ; ১৯ শতাংশ জেনেরাল ক্যাটেগরিভুক্ত ব্যক্তি এবং ৬ শতাংশ অবলুপ্তপ্রায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী। আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় ৭১ শতাংশ মহিলা এই সমীক্ষায় ভাগ নিতে এগিয়ে এসেছে।

এরা জানিয়েছে যে এইসব পরিবারের প্রায় ১৮ শতাংশ শিশু সন্তান এই সময়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ৬ শতাংশ পরিবারের শিশুসন্তানরা কাজের খোঁজে মা বাবার সঙ্গে পথে নেমেছে।

৫ শতাংশ পরিবার মাসে ১৫,০০০ টাকার বেশি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর ৭০ শতাংশ পরিবারের আয় মাসে ৭০০০ টাকার নীচে। ৬৬ শতাংশ মানুষের আয় দ্রুত নেমে এসেছে অতিমারির পর্যায়ে। ৫৯ শতাংশ জানিয়েছে যে, প্রাক-অতিমারির কালের তুলনায় পরবর্তীকালে তাদের আয় নেমে এসেছে অর্ধেকে এবং অনেকের তার অনেক নিচে। ৬৭ শতাংশ পরিবার রান্নার গ্যাস ব্যবহার করেনি।

এর মধ্যেও হাঙ্গার ওয়াচ সার্ভে-২ লক্ষ করেছে যে গণবন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পড়তেও পড়েনি। বরঞ্চ এই অতিমারির সময়ে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের বাধ্যবাধকতায় সরকারকে বিনামূল্যে ৫ কেজি অতিরিক্ত রেশন বন্টন করতে হয়েছে। যদিও এই আইনের আওতায় যে ৮০ কোটি মানুষ এসেছে, তার মধ্যে যথেষ্ট বেনোজল আছে এবং এর সুযোগে এক ধরনের দুর্নীতির জাল বিছানো হয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। আবার যে সব প্রবাসী শ্রমজীবী মানুষ পরিবার সহ লকডাউনে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছিলেন বা রেশন কার্ড না থাকায় গণবন্টনের সুযোগ পাননি তাদের অবস্থা যে ভীষণ শোচনীয় হয়ে পড়েছে তাও সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তাছাড়া শুধু চাল বা গম নয়, তেল ও প্রোটিনযুক্ত দানাশস্যও গণবন্টনের আওতায় আসা দরকার। কারণ সেটাই হবে প্রকৃত খাদ্য সুরক্ষার অভিমুখে যাত্রা। এছাড়া আই সি ডি এস এবং অন্যান্য প্রকল্পে বহুগুণ বাজেট বাড়ানো না হলে, শিশুদের পুষ্টি না হলে ভবিষ্যতের নাগরিক সমাজ আরো অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। মোটের কথা কোনো রকমে খাদ্য সুরক্ষা আইন এবার দেশবাসীকে চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

**—ঃ ভ্রম সংশোধন ঃ—**

- পাঞ্জাব বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা-১১৭টি ছাপানোর ভুলে ৭০টি লেখা হয়েছে।
- ৮নং পৃষ্ঠায় পৌরসভা নির্বাচনে ওয়ার্ড হিসেবে দক্ষিণ দমদম-এ ২৩ নং ওয়ার্ড হবে। ২০ নং ওয়ার্ড হবে না।

এই ভ্রান্তির জন্য আমরাও দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। —সম্পাদকগুলী, গণবার্তা

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-